

আশ্রয়

রমাপদ চৌধুরী



আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড

কলকাতা-৯

অরবিন্দ গুহ
প্রিয়বরেন্দ্র

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৯

প্রচ্ছদ সূত্রত চৌধুরী

ISBN 81-7066-158-7

আনন্দের পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেলিয়ারাটোলা সেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রিন্টিং ও বন্টন কার্য সম্পন্ন এবং
আনন্দের প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
সি ২৪৮ সি আই টি ডিএম নং ৬ এর কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
উৎকর্ষিত মুদ্রিত।

মূল্য ১৪.০০

এই লেখকের অন্যান্য বই

গল্প-সমগ্র

উপন্যাস সমগ্র ১ ● উপন্যাস সমগ্র ২

বনপলাশির পদাবলী ● এই পৃথিবী পাছনিবাস

যে যেখানে দাঁড়িয়ে ● ধীপের নাম টিয়ারঙ

এখনই ● লালবাসি

প্রথম গ্রন্থ ● পরাজিত সম্রাট

শিকনিক ● অভিমন্যু

খারিজ ● লজ্জা ● কদম ● বীজ ● রূপ ● চড়াই

ছাদ ● বাহিরি ● স্বজন ● দ্বিতীয়া

শেফের সীমানা ● ব্যাডি বদলে যায়

আকাশপ্রদীপ

দাগ

ছায়ায় বছর বয়সে পৌছে বুকে এরকম একটা ব্যথা বেতে হবে হিরণ্ময় কোনদিন ভাবেনি। এমন একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে সে-আশঙ্কা প্রথম দিন থেকেই ছিল। কিন্তু মনের মধ্যে কোন সুপ্ত আশঙ্কা থাকা, আর সত্যি সত্যি তা ঘটে যাওয়া এক নয়। ভাসা ভাসা ভয় আসলে ভেসে যাওয়া টুকরো মেঘের মত। ব্যাধি হবেই কেউ ভাবে না, শুধু একটা সন্দেহ থাকে, ব্যাধি হবে না তো।

তাছাড়া যথেষ্ট বেড়েছে বলেই হয়তো নিজের ওপর আস্থা কমছে, সব ব্যাপারেই কেমন সন্দেহ। যথেষ্ট তাকে অভিজ্ঞতা দিয়েছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা মানুষকে বড়ো ভীতু করে দেয়। তাই গোড়া থেকেই হিরণ্ময়ের কোন সাহস ছিল না, বরং পাকেপ্রকারে ও শুভাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিল।

শুভা ওর কথায় কান দেয়নি। কোন কথাতেই বা কান দেয়। ছিটকে বলে উঠেছে, থামো তো, আমার সমস্যা আমাকে ভাবতে দাও।

পাছে হিরণ্ময় আবার কিছু বলে বসে, হাতের খাড়নটা নিয়ে সপাং সপাং করে আলমারিটার গায়ে চড়চাপড়ের ভঙ্গিতে ধুলো ঝেড়েছে শুভা, ব্যস্ততা বেশি করে আসবাবপত্রের ধুলো মুছতে শুরু করেছে।

কিন্তু তারই ফাঁকে অশ্রুটিভাবে বলা, 'সংসারের কোন কাজটাই বা ভুলি মেথো,' হিরণ্ময়ের কান এড়িয়ে যায়নি। দুম্ করে বিনা নোটিসে 'কাজের লোক' চলে যাওয়ার মত অবটন যখনই ঘটবে তখনই সংসারে এইরকম একটা অশান্তি বোধহয় সার্বজনীন।

আজকাল এত ডিভোর্স বাড়ছে কেন তা নিয়ে একদিন আগিসে আলোচনা হচ্ছিল। উমেশ, পাশের টেকিলের উমেশ, বলে বসল, কাজের লোক। বলে সেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে দাঁত ঝুটতে শুরু করল।

ওরা তো অবাক। বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গে কাজের লোকের কি সম্পর্ক বুঝে বের করার চেষ্টা করল। বুঝে পেল না বলেই অবাক কিম্বা উমেশের মুখেও সিকে ডাকিয়ে রইল।

উদ্দেশ্যের মধ্যে তখন চার-আনা মাপের কৌতুকের হাসি।

দীতের ফাঁক থেকে লুকোনো পদার্থটি কাঠির ডগায় বের করে এনে ইবৎ পর্ববক্ষণ করে কাঠিটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে উদ্দেশ্য বললে, ঠিকে কি বেটি একদিন না এলে আমার বৌয়ের যে কি রণচণ্ডী মূর্তি হয় তা তো দেখেনি।

সবাই হেসে উঠল। সুধাকান্তের বয়েস কম, সে শুধু গাঞ্জীর মুখে বললে, 'ঠিকে কি বেটি' আবার কি কথা। আনপালমেটারি।

উদ্দেশ্য হাসল। বললে, 'ভায়া, আমরা এখন পালমেটে বসে নেই।

তারপর হিরন্ময়ের নিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমাদের সময়ে, ইন অগওয়ার ইয়াং ডেক্স একটা চাকর গেলে কটপট আরেকটা ছুটে যেত, পনেরো কি কুড়ি টাকায়। সেজনে একই বউ নিয়ে তিরিশ চত্বিশ বছর কেটে যেত। তারপর সুধাকান্তের দিগন্ত তাকিয়ে বজ্রাতি হাসি হেসে বলেছিল, ভোমরা ভাই কি লাগি, কি-চাকর পালান। কি রাত্তা পরিকার, বউ রেখে নিয়ে ডিভোর্স করে দিল, তুমিও নতুন বউ এনে ঘর-সংসার করতে শুরু করলে।

তারপর মুখে বেশ একটা গ্যাঞ্জীর এনে বলেছিল, এখন তো আর নতুন ছুটেবে না আমাদের— ব্যক্তি যদি রাস্তাতে চাও সংসারে, আমাদের সুধাকান্তের ভাষায় 'কাজের লোক'— একটা পালমেই আরেকটার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

একটু থেমে বলেছিল, আর নতুন বেটা আসবে সে দশ টাকা বেশি চাইবে, তা নিয়ে সিও। পুরোনো বউটাকে তো ঘরে রাখতে হবে।

তখন হিরন্ময়ও সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠেছিল। কিন্তু ওর আপত্তি শুনে শুভা যে-ভাবে লম্ব করে আসবাবের গায়ে ঝাড়নের চকচাপড় মারতে শুরু করেছিল, যেন চাপা রাগের অদৃশ্য চকুগুলো হিরন্ময়ের উদ্দেশ্যেই। আর উদ্দেশ্যের কণ্ঠগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল।

সংসারের জাল-পাঁচটা কেড়ে যা হয়ে থাকে— এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অর্থাৎ সুখকারে উড়ে গিয়েছিল হিরন্ময়ের মূসু আপত্তিটুকু।

সন্ধ্যাবেলায় শুধু কথা কুটেছিল শুভার মুখে, বেশ রূপত বর, ভোমার আর কি, বলে দিয়েই খালস। একটা ছুটিয়ে জানতে তো পারে না।

হিরন্ময় তাই অনিচ্ছায় সঙ্গেই বলেছে, তবে রাখে।

শুভারও তো কয়েক রকম ছিল না, কিন্তু সব ব্যাপারে হিরন্ময়ের এই ভয়-ভয় জব্বল তাড়-মধ্যে একেবারে নেই। কেন নেই ও বুঝতে পারে না।

হিরন্ময়ের আপত্তি এবং আপত্তা যেন নেহাতই ছেলোমানুবি, এমনভাবে হেসে

উঠেছিল শুভা।

এখন ওর মেগে নিয়ে শুভার মুখের ওপর বলারও উপায় নেই, কি, হলো তো।

বিশ্বাসের অধোমুখি না পড়লে কারও আপত্তি উপদেশ সারথানবাপীকে মনুষ্য দাম দেয় না। নিজের জীও না।

শুধু মূহুর্তের জন্যে হিরন্ময়ের মনের ভেতর সেই সব পুরোনো মূর্তি ঝিলিক নিয়ে ফেলা। কিন্তু মেগে নিয়ে তখন আর বলা যায় না, আমি তো আগেই বলেছিলাম।

ছাত্রের বছরের হিরন্ময়ের চোখের সামনে তখন একটা ভয়ঙ্কর বিপদ। ও শুভার ধমধমে মুখ দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কারো কিছু হ'ল নাকি?

অনেকদিন পরে ও বেশ খুশি খুশি মনে আগিস থেকে ফিরেছিল। এমন একটা দুঃসংবাদ যে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে জানবে কি করে।

আজকাল হিরন্ময় বড়ো চুপচাপ হয়ে গেছে, মুখে সবসময়েই কেমন গাঞ্জীর হাস। উদ্দেশ্য কিংবা সুধাকান্তেরও তা চোখ এড়িয়ে যায়নি। কেন তা ওরা সবসময়ই অনুমান করতে পারে। মুখ দুটে তবী কেউ কিছু বলে না। যেটুকু বলার ও নিজেই তো তা আভাসে ইঙ্গিতে টুকরো টুকরো কথায় জানিয়ে দিয়েছে।

এই বছরসে পৌছে এখন বুঝতে পারছে সমস্ত জীবনটাই হিসেবের ধরমিলে বোঝাই হয়ে আছে। সবই নাগালের বাইরে চলে গেছে, শুভার নেবারও উপায় নেই।

আর দুটো বছর, তার পরই তো রিটারায়মেন্ট। চাকরি থেকে অবসর। অবসর লম্বা কি সুখের আর ছেলোয়ান। আদেকার দিনে রোমহর সজিই তাই ছিল। সারা জীবন খাটাখাটনির পর অফুরন্ত ছুটি। দুপুরে দুমোও, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াও, জমানো টাকার সুখে দিবা মুখে সংসার চালাও। হিরন্ময়ও একদিন এইরকম একটা স্বপ্ন দেখত।

কিন্তু চোখের সামনে দিয়ে বিনকাল কেমন পাড়ন্ত গেল। এখন অবসর মানে একটা রিটায়র। ভবিষ্যতের ভাষা ভাবতে ভাবতেই হয়তো হিরন্ময় এমন চুপচাপ হয়ে গেছে। ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না।

শুধু তারই মধ্যে সেদিন মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠল।

খবরটা এনেছিল উদ্দেশ্য। আগিলের মান ডিপার্টমেন্টের স্কু গোপন খবরগুলোও আগতোসেই জেনে কেলতে পারে। কখনও কখনও সেগুলো অবশ্য শুদ্ধ হয়েই উবে যায়, আবার কোনটা কোনটা সত্যিও হয়।

উমেশ এসে বললে, একটা সুখবর আছে।

কোন সুখবরেই এখন আর হিরন্ময় বিচলিত হয় না। ও তো চোখের সামনে পূর্ণচ্ছেদ দেখতে পাচ্ছে। একটা মোটা দাগের দাঁড়ি। তাই নিরাশ এবং নীরস গলায় বললে, এখন আর আমার কাছে কিছুই সুখবর নয়, শুধু তোমাদের জন্যে।

উমেশ ধীরে ধীরে বললে, না, আপনারও।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বললে, সেই যে গতবছর আমন্ত্রণ ক'জন ওপরের ঘ্রোডের জন্যে আঁপীল করেছিলাম, ডিরেক্টর পাশ করে দিয়েছেন। একেবারে ঘ্রোডের মুখের খবর।

তারপর খুব খুশি-খুশি মুখে বললে, রেন্টসপেকটিভ।

উমেশের উল্লাস হিরন্ময় বুঝতে পারে। ওর এখনও পাঁচ-ছ বছর চাকরি আছে, একটা প্রোমোশনের সম্ভাবনাও।

হিরন্ময়ের মুখে কোন উল্লাস দেখা গেল না।

কিন্তু উমেশ দমে যাবার পাত্র নয়। এমন একটা দক্ষল খবর নিয়ে এল, অথচ হিরন্ময় তার কোন মূল্যই দিতে চাইছে না। লোকটা পালল হয়ে গেল নাকি? নাকি বৈরাগ্য।

ঈর্ষ উত্তেজিত হয়ে বললে, কি বলছেন? মাসে চারশো টাকা করে বাড়বে, তাছাড়া রেন্টসপেকটিভ।

হিরন্ময় এবার নড়েচড়ে বসল। সত্যি বলছে?

উমেশ কি বলল না বলল সেদিকে আর কান দিল না। ও তখন মনে মনে হিসেব করতে শুরু করে দিয়েছে। মাসে চারশো মানে বছরে চার হাজার অটিশো। প্রায় পাঁচ হাজার। দু'বছর এখনও চাকরি আছে, তা হ'লে হ'ল দিয়ে প্রায় দশ হাজার। রেন্টসপেকটিভও আরো পাঁচ। পনেরো হাজারই বলা যায়। এ টাকাটা আর খরচ করবে না, জমাবে। আজকাল কাপজে তো কত কি বিজ্ঞাপন দেয় বড় বড় কোম্পানি। ডিবেঙ্কার, বন্ড। পনেরো পারসেন্ট ইন্টারেস্ট ট পের। পনেরো হাজারে তা হ'লে দাঁড়ায় সাড়ে বাইশশো। রিটার্নসমেন্টের পর ইলেকট্রিকের বিলটা এর থেকেই মিটে যাবে, আরো অন্য ছোটখাটো কোন খরচ।

এতসব হিসেব করার পরই হতাশ হয়ে গিয়েছিল। আজকাল প্রায়ই হয়। সামান্য কিছু কিছু জমাতে পেরেছে, কিন্তু প্রভিডেন্ট ফান্ড তো এমন কিছু হবে না। জীবনের বেশির ভাগটাই তো কম মাইনেয় কেটে গেছে, তাই শি একের

অঙ্ক বাড়েনি। সেকালের জমানো টাকা সুদে-আসলে ডবল হয়েই বা কি লাভ, জিনিসপত্রের দাম তো বেড়েছে কুড়িগুণ। তাছাড়া এ শি একের টাকা পেয়ে ব্যাঙ্কেই রাখা ডিবেঙ্কারই কেনো তার ওপর টাকার দিতে হবে। কেটেকুটে কত আসবে তাও হিসেব করে দেখেছে। সংসার চলেবে না। শালায় গরমেই... কুর্তি করবে, বিলতে বেড়াবে, আর একটা লোক সারাজীবন কাজ করে শেষে মানুষের মত ঝাঁচতে পাবে না।

তাই এই সামান্য টাকাটাও লোভনীয় মনে হ'ল। উমেশের এতখানি উল্লাস বোধহয় সে-জানোই।

ধবরটা পেয়ে থেকে উমেশের সত্যিই খুব উল্লাস। হবারই কথা, ওর তো এখনও পাঁচ-ছ বছর চাকরি আছে। কিন্তু ও কি এখনই রিটার্নসমেন্টের পত্রের দিনগুলোর কথা ভাবছে? মনে হয় না। হিরন্ময়ও তো ভাবত না। নিত্যদিনের অভাব অনটনে ওসব দিনের কথা সবাই ভুলে থাকতে চায়।

পাঁচটা বাজতে না বাজতে উমেশ এসে হাজির হয়েছিল। সামনের খোলা কাইলটা বন্ধ করে দিয়ে বললে, চলুন হিরন্ময়দা, আজ একটু চাইনীজ খাবো, এত বড় একটা সুখবর।

হেসে উঠে বললে, খাওয়াবো, খাওয়াবো।

অর্থাৎ হিরন্ময়কে নিশ্চিত করে দিল টাকাটা তার পকেট থেকে যাবে না। ও নিজেও জানে ইসানীং ওকে অনেকে কপল ভাবছে। অথচ বাজে খরচ এ ক'বছর কিছুটা কমিয়েও তো ভবিষ্যৎ গড়তে পারেনি। ভবিষ্যৎ এখন ওর কাছে একটা আতঙ্ক। অথচ স্ত্রী বোঝে না, ছেলেমেয়েরা বোঝে না।

উমেশ প্রায় হাত ধরে টেনে তুলল হিরন্ময়কে।

চাইনীজ রেস্টুরেন্টে ঢোকান সময়ে নিজেই বেশ হাসা লাগল। ক্রিসেও পেরেছিল, বাড়ি ফিরে সেই তো দু'খানা রুটি আর একটু তরকারি, কিংবা নিছক দু'শীস সৈকা পাউরুটি, চারে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাও। খাওয়ার ইচ্ছেটাও যেন চলে গেছে আজকাল। বোধহয় বয়েস।

কেন বোঝা গেল উমেশ ধবরটাকে নিছক শুভব ভাবে, পাকা খবর বলেই বিশ্বাস করেছে।

এতকণে হাসতে পারল হিরন্ময়। কোপের একটা টেবিলে গিয়ে বসল দু'জনে, চীনে-মাদার গল্প মাথা আমেজে এল অনেক দিন পরে। আর চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললে, তুমি তো টাকাটা হাতে পাবার আগেই সব খরচ করে বসাবে, দেখছি।

উদ্দেশ্যও হারল। কললে, অজুহাত হিরণ্যমালা, অজুহাত। এসব তো আজকাল ভুলেই গেছি, একটু আনন্দ করার অজুহাতে বাড়ির লোকদের ফাঁকি নিয়ে....

হিরণ্যর শব্দ করে হেসে উঠল।

উদ্দেশ্যও হারল। কললে, মাইনে বাড়ি মানে তো একটা মাস আনন্দ। জীবনে কতবারই তো পেলেন, কিন্তু ঐ এক মাস, তারপর কোথায় যে সব দুর্ভিক্ষ ঘায় ম্যাগনিকলিং গ্লাস দিয়েও খুঁজে পাই না।

হিরণ্যর বিষয়ভাবে বলল, এখন তাই বুঝতে পারছি এই মাইনে বাড়ি, ইনক্রিমেন্ট এ-সবই কাল হয়েছে। খরচের হাত বেড়ে যায়, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং 'হে' রিটার্নসমেন্টের পর কত কমাবে?

একটু খেমে হাসবার চেষ্টা করল। বানানো হাসি মুখে এনে বললে, শি এক যৌবক বাড়ি, শাওয়ার সময় ইনক্রিমেন্ট সব নিলে খেয়ে নেয়।

উদ্দেশ্য বললে, ও সব ছাড়ুন তো, এখন ফুটি করে খেয়ে নিই।

বলে আড়াল দিল।

বেশ আনন্দ করে খেতে খেতে উদ্দেশ্য শুধু একবার বলেছিল, না। সে আগের দিনের মত প্রিপারেশন আর নেই।

হিরণ্যরও তাই মনে হচ্ছিল। আগের দিন। প্রায় ভুলেই গেছে। এক সময় যে ভরও খুবক বয়েস ছিল এখন আর মনেই পড়ে না। অতীত কি আশ্চর্য, ও যে আর মুখক নয় তাও মনে থাকে না। শাশের টেবিলে বসে একটা পুরো পরিবারের মধ্যে বেশ ছিপছিপে সুন্দর চেহারার তরুণী মেরেটির দিকে বার কয়েক তাকিয়ে নিয়েছে হিরণ্যর। স্ত্রী-গলা রঙিনের ঢাল অলি। মুখখানাও বেশ সুন্দর।

সুন্দরতার কথা মনে পড়ে গেল। মুহুর্তের জন্যে। এখন সুমিত্রা কোথায় কে জানে। জানার ইচ্ছেও হয়নি। নিশ্চয় বুড়িয়ে গেছে, হয়তো ফুলারী। মস্তি-নাডনী নিয়ে কোথাও সসোর করছে। হাসি এসে গিয়েছিল, যেটা চাপা দিল। মনে মনে হিসেব করে দেখল হিরণ্যর তখন সাতাশ-আটাল।

বাড়িয়া বেশ হতেই উদ্দেশ্য বিল মেটাচ্ছে, হিরণ্যর নিজের পকেটে হাত দিয়ে দেখল, কত নিয়ে বেরিয়েছিল আজ মনে মনে ভাবল, মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এখন আর শুধু নিজে খেয়েই ভুগি হয় না। টাকা থাকলে স্ত্রী এবং ফেলেক্সেরদের জন্যে প্যাকেট করে কিছু নিয়েও যেত। আর সে-কন্যা উদ্দেশ্যের কাছে ধার চাইতেও বাধ্য থাকে টেকল।

আজকাল একা ভাল খাবার খেয়ে তৃপ্তি হয় না, কোথাও একা একা বেড়ায়

যেতে ইচ্ছে হয় না, ভাল কিছু দেখলে— নটিক কিংবা একজিবিজন, মনে হয় বাড়ির সকলে মিলে না দেখলে আনন্দ নেই। এরই নাম বোম্বার্ডার বার্কস। একটা সময় থাকে, এখন বাড়িটা শুধু ফেরার জন্যে, বাইরে বাইরেই জীবনটা কেটে যায়। আর বয়েস হলে মনে হয় সকলকে নিয়ে আনন্দটুকু ভাগ্যজালি করে নিই। সেজন্যে এখন আর একা একা ওসব কিছুই ভাল লাগে না।

রাস্তায় নেমে কোণের দোকান থেকে একটা পান কিনে কল-উদ্দেশ্য। আর মজা সঙ্গে ওর মিনিবাস এসে পড়তেই হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ছুটে গিয়ে ধরল।

হিরণ্যর বাস গেল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে। মিনিবাস, কিন্তু কি ভান্য, ও যেখানটায় দাঁড়াল, সীট ছেড়ে একজন নেমে গেল। কসতে গেল হিরণ্যর। এমন তো হয় না, মনটা বেদম খুলি হয়ে উঠল।

খুলি খুলি মন নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। বরাক দটি দু'মুহুর্তে অজুহাতে খাবে না খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। চীনে খাবার খেয়ে জেসেছে একখাটা চোপে যাওয়াই ভাল। শুভার সব সময়ে ভয় এ বয়েসে বাইরের খাবার খেলেই পরীর খারাপ হবে। বয়েস, বয়েস। শুভা কিছুতেই ভুলতে দেয় না।

না, বলেই ফেলবে।

মুখে তখনও খুলির ভাবটা লেগে আছে। কে জানত একটা ভরষার বিপদ বাড়িতে অপেক্ষা করছে। একটা আতঙ্ক, যা মুহুর্তে সারা পরিবারের দুখ কেড়ে নেবে।

সুখ অবস্থা এখন আর নেই।

বাড়িওয়াল ভরলোক শি ডব্লু ডি-ও চাকরি করতেন। শি চাকরি কখনো বতেননি। কিন্তু কিস্তাবে যে এই পেয়ায় বাড়িখানা তুলেছেন সে এক রহস্য। পাড়ার সীতানাথবাবু অবস্থা নানা কথা বলেন, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে বোকা লাগে।

এ পাড়ার সকলেই সকলের সঙ্গে বেশ হাসিমুখে কথাবার্তা বলে। বাজারের খলি হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে যখন গল্প জুড়ে দেয়, মনে হয় যেন কত আনন্দ। কিন্তু তারপরই তৃতীয় ব্যক্তির কাছে পদাশ্রয় পরাম্পরের হাড়ির ধর টেনে বের করে আনে। দু-একজনের তো এতাবেই শাক্যলাপ বন্ধ হয়ে গেছে।

তবে হিরণ্যর সঙ্গে একা সকলেই বেশ ভাল ব্যবহারই করে। যদিও ভেতরে ভেতরে কি বলে কে জানে। বসুক, ওসব গায়ে মাখলে চলে না, মেনে নিতে হয়। ওসব তো বাস্তবী মধ্যবিত্তের দক্ষুর।

সীতানাথবাবুরও নিজেও বাড়ি, তবে ছোটখাটো। নিজেই হাসতে হাসতে বলেছিলেন, এই যে ছোট বাড়িটা দেখছেন, এটা আরো ছোট ছিল। একতলা। ছিলাম ভাড়াটে, শরিকি বিবাদ চলছিল তিন ভাইয়ের, আমার কাছে বেচে দিয়ে টাকা ভাগ্যভাগি করে নিল। দিনরাত কগড়া, দিনরাত মারামারি।

বলে হাসলেন আবার। বললেন, বাড়ি বেচে দিল বললে ভুল হবে, আমি তো বলি শান্তি কিনল।

একটু থেমে বলেছিলেন, দোতলাটা আমিই বানিয়েছি।
কানে কানে বলার মত করে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ভাড়াটে হতে হলে এই রকম বাড়ির ভাড়াটে হবেন। কিংবা ধরুন বিধবার সম্পত্তি, দেখাশোনা করার কেউ নেই, কোটকাছারির নাম শুনেলে ভিরমি খায়...

হিরণ্য তখন নতুন এসেছে এ-পাড়ায়, এই বাড়িতে।
মুদু আপত্তি জ্ঞানিয়ে বলেছিল, না না, বীরেশ্বরবাবু লোক ভালই। ঠগ হলেমেনেব্বা জে আমাদের বাড়ির লোক মনে করে।

সীতানাথবাবু অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলেছিলেন, লোক খারাপ আমিই বা কখন বললাম। কি বিপদ।

একটু থেমে বলেছিলেন, ঘুস নিলেই কি আর লোক খারাপ হয়ে যায় ?
—ঘুস ? অবাক হয়েছিল হিরণ্য নিজেই।

আর সীতানাথবাবু হেসেছিলেন। —ঘুস নয় মশাই, ঘুস নয়, পুকুরচুরি। তা না হলে পি ডবলু ডির সামান্য চাকরি করে এই রকম চার তলা একটা বাড়ি করা যায় ?

পি ডবলু ডির চাকরির কথাটা হিরণ্য জানত না। কিন্তু শ্রেফ ঘুস নিয়ে এই বিরাট বাড়িটা বানিয়েছেন বীরেশ্বরবাবু, সে-কথাটাও বিশ্বাস হয়নি। মনে মনে বলেছে, জেলাসি। নিছক ঈর্ষা। নিজে একটা ছোটখাটো দোতলা বাড়ি করণ্ড মানুষের শান্তি নেই, পাশে কেউ চারতলা হাঁকালেই বুক জলে যায়।

হাসতে হাসতে শুভাকে সে-কথা বলেছিল।

একদা সীতানাথবাবুর কথাগুলোই বিশ্বাস করে। রাতায় দেখা হলে বাড়িয়ে পড়ে যেতে গর করে। নিজেই বলে, ছোটলোক ক্ষয়ি, ছোটলোক। বাড়িটাই বড় করছে, নিজে যে ছোট হয়ে আছে সে খেয়াল নেই।

সত্যি, মাঝে মাঝে হিরণ্যের বড়ো আশ্চর্য লাগে। মদুস কি করে যে এতখানি বদলে যায় বুঝতে পারে না।

প্রথম প্রথম কত অন্তরঙ্গ, কত আন্তরিকতা।

বাড়ির দালালের সঙ্গে বাড়িটা দেখতে এসেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন নতুন রঙ করেছে, দরজা জানালায় নতুন রঙ পড়েছে। চারতলা বাড়ির প্রত্যেক কোণে দুখানা করে ইয়াট, প্রত্যেক ইয়াটের সামনে গোলবারান্দা।

শুভাও সঙ্গে এসেছিল।

দালাল ছোটো আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, চারতলার ঐ ইয়াটটা। পূব দিক একেবারে খোলা, শীতকালে দিবা রোদ্রর পাথেন।

হিরণ্য তখন হন্যে হয়ে ইয়াট খুঁজছে। উকিলের দোষে না নিজের দোষে আজও জানে না, মামলায় হেরে গিয়ে উচ্ছেদের নোটিস পেয়েছে।

নিত্যদিন ছোটোছোটো, দালালের হাতে ধরা, পায়ে প্রণামী, ইয়াট পছন্দ হয় তো ভাড়া নাগালের বাইরে। ভাড়া পছন্দ হলে ইয়াট সেখে পালাতে ইচ্ছে করে।

শেষে এই ইয়াট। বাইরে থেকে দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। আসলে তখন হাতে আর সময়ও নেই। সে কি নিরাজয় দুর্ভাবনার দিন যে গেছে। তাবলেও আতঙ্ক।

শুভার পছন্দ হয়ে গেল গোল বারান্দাটা। রাত্তা থেকেই দেখে বলে উঠল, মনি ইয়াট লাগাবো।

দালাল ছোকরাটাও হেসে ফেলেছিল।

হিরণ্য অবশ্য প্রথম প্রথম খুঁজেছিল এমন বাড়ি, যে বাড়িতে বাড়িওয়ালার থাকে না। তেমন তেমন বাড়িও তো কোলকাতায় অনেক আছে, শুধুই ভাড়াটে, বাড়ির মালিক অন্যত্র থাকে, লোক পাঠিয়ে ভাড়া আদায় করে।

পারনি। ওসব কি সকলের ভাগ্যে জোটে। তার জন্যে তেমন তেমন কুষ্টি-কুকুজি নিয়ে জন্মাতে হয়।

গ্যোটের বাইরে থেমে পড়ে বাড়িটা ভাল করে দেখল হিরণ্য। জিগ্যেস করল। ল্যান্ডলর্ড কোন তলার থাকেন ?

দালাল ছোকরাটি হেসে বললে, তিনতলায়, পুরো ফ্লোরটাই ঠগ। আপনার স্যার ভাবনা কিসের, আপনি তো তাঁর মাথার ওপর থাকছেন। আপনাকে ভিত্তিতে তবে তো জলের ট্যাঙ্কের চাবি।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বলেছিল, টেনেন্টদের জিগ্যেস করে দেখুন, এ বাড়িতে জলের অস্তাব নেই।

একটু রসিকতায় করেছিল, জলের ট্যাঙ্ক নয় স্যার, নায়গা ফল্স।

শুভা তো হেসে কুটিকুটি।

সামনের গ্যারেজ ঘর থেকে ডানদিক বাঁদিক করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছিল

ওরা। অত ভাল করে হিসেব করে দেখনি, কোনটা কোন দিক ভাল বুঝতেও পারেনি। দালাল ছোকরাটি নির্বিবাদে পশ্চিম দিকের জানালা দুটো খুলে দিয়ে বলেছিল, সাউথ। হু হু হাওয়া পাবেন।

ফ্ল্যাটে উঠে এসে দুদিন বাদে বুঝতে পেরেছিল ছোকরাটি ওদের কত বোকা বানিয়েছে।

পরে অবশ্য আক্ষেপও ছিল না। কোলকাতায় ক'জনই বা সাউথ পায়। দিবা মনিয়রে নিয়ে দেখতে দেখতে দশটা বছর তো কেটে গেল। বার দুই ভাড়া বাড়িতে হয়েছে এই যা। শাস্তি কেনার জন্যে সব ভাড়াটেরাই রাজি হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে হিরণ্ময়ও।

তবে ইদানীং একটু দুর্ভাবনাও হচ্ছে। আর তো দুটো বছর। রিটারায়মেন্টের পর এই ভাড়াটাও বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এদিকে ফ্ল্যাটের দাম যে-সরকম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, কিনতে পারবে বলে ভরসা নেই।

শুভা মাঝে মাঝে ধমক দেয়, এরাও যদি মামলা করে উঠিয়ে দেয় তখন যাবে কোথায়? মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় তো চাই।

চাই তো সব কিছুই। মেয়ের বিয়ে, ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাটের মেন্টেনেন্স, কর্পোরেশনের ট্যাক্স, জমানো আর পি এফের টাকার সুদ থেকে মাসে মাসে সংসার চালাবার টাকা। সে টাকার ওপর যা ইন্টারেস্ট পারে তার ওপরও ইনকাম ট্যাক্স।

শুভা এ-সব কথা বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। ওর একটাই বাসনা, ফ্ল্যাট। ইদানীং বাড়িওয়ালার সঙ্গে তেমন সম্ভাব নেই বলেই দৃষ্টিভ্রষ্টা হিরণ্ময়েরও। চীনে রেস্টুরেন্টে পেট ভরে খেয়ে মিনিবাসে একটা বসার সীট পেয়েছিল বলে মনটা বেশ খুশি খুশি ছিল। বুকের কোণে একটাই শুধু খিচিখি। ছেলেমেয়েদের জন্যে, শুভার জন্যে কিছু আনতে পারল না।

হিরণ্ময় তখনও জানে না কি সাজসজ্জা বিপদ ফ্ল্যাটের দরজার ওপারে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

এই তল্লাটটা নতুন গড়ে উঠেছে। বড় রাস্তা থেকে বীক নিয়ে একটা সরু রাস্তা। কর্পোরেশন এখনও নেয়নি। নিলে, ফুটপাথ বানালে রাস্তাটা আরো সরু হয়ে যাবে। সেজন্যেই বীরেশ্বরবাবুকে বেশ খানিকটা জমি ছেড়ে দিয়ে চারতলা তুলতে হয়েছে। সীতানাথবাবু অবশ্য বলেন, চারতলাটা উনি বে-আইনি ভাবে তুলেছেন।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে অসম্ভাবের সূত্রপাত বাড়ি নিয়ে নয়, রাস্তা নিয়ে।

রাস্তার দুধারে ছোট ছোট বাড়ি, অঞ্চ অনেকেরই গাড়ি আছে। তাছাড়া গাড়িওয়ালা লোকের যাতায়াতও একটু বেশি এ-সব বাড়িতে। হয়তো রাস্তাটা সরু বলেই বেশি মনে হয়।

উপায় তো নেই, গাড়ি রাখতে হলে কারো না কারো দরজায়, সে-বেচনার বেরোনার রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ফুটপাথ তো নেই, তাই দরজা খেসেই গাড়ি রাখে সকলে।

এ নিয়ে চৈতামিচি একটু মাঝে মাঝেই হয়। এ বাড়ির সঙ্গে ও বাড়ির। যারা বাইরে থেকে দেখা করতে আসে তারা অতশত বোঝে না, ফীক পেলেই পার্ক করে দেয়। তখন দোষ তার, যার বাড়িতে ভদ্রলোক এসেছেন।

হিরণ্ময়ের এক বন্ধু বিকাশ, ছেলেবেলার বন্ধু, হঠাৎ একদিন আপিসে গিয়ে হাজির।

বললে, অনেকদিন দেখা হয় না, ভাবলাম দেখে আসি বেঁচে আছিস কিনা। হিরণ্ময় খুব খুশি হয়ে উঠেছিল। ছেলেবেলার বন্ধুদের সঙ্গে তোড়জোড় করে দেখা করা হয়ে ওঠে না বটে, কিন্তু কেউ এলে দারুণ ভাল লাগে। যারা জীবনে সাক্ষাৎশূন্য হয়েছে সে বন্ধুদের তো আরো ভাল লাগে।

গাড়ি আছে বিকাশের, নিজেই চালায়। হিরণ্ময়কে তুলে নিয়ে গিয়ে একেবারে অন্ধকারের গড়ের মাঠ। রাস্তা ছেড়ে ঘাস বিছানো মাঠের মধ্যে বাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে দু'জনে বসে বসে কত গল্প।

তারপর রাত একটু বাড়তেই বিকাশ বললে, চল তোকৈ নামিয়ে দিয়ে বাবো। হিরণ্ময় না-না করেছিল, শোনেনি।

ঐ সরু গলিটায় গাড়ি ঢোকাতে বের করতে অসুবিধে হবে বলে হিরণ্ময় বড় রাস্তাতেই নেমে যেতে চেয়েছিল। বিকাশ শুনল না।

বললে, চল না। বাড়ির দরজাতেই নামিয়ে দিচ্ছি।

নাছোড়বান্দা। বললে, বাড়িটাও চিনে যাই। তুই তো একবারও ঘেঁতে বসিসনি।

গলিটা সরু, গাড়ি ঢোকাতে অসুবিধে হবে, এসবই আসল কারণ নয়। বছর দশেক আগে হিরণ্ময়রা যে বাড়িতে ছিল সেটা বেশ বড় রাস্তায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাড়িটাও বড় ছিল। তখন নিরমিত আনাগোনাও ছিল। এত দূরে চলে আসার জন্যেই হয়তো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যদিও বাইরে বাইরে দু'চারবার সাক্ষাৎ হয়েছে।

ঠিকই তো, হিরণ্ময়ই বোধহয় কোনদিন ওকে টেনে আনতে চায়নি। এই

হোটেলটি বন্ধদের দোষেতেও কুঠা, এই খোয়া ছড়ানো শুরু গলি, আর সিঁড়ি ভেঙে ওঠা চারতলা—সব মিলিয়ে হিরণ্ময়ের নিজেকে বড়ো হোটেল মনে হত। ও তাই বিকাশের সুন্দর বাড়িটার কথা ভেবে এড়িয়ে এড়িয়ে চালিয়েছে।

কিন্তু আর উপায় নেই, নিয়ে যেতেই হল।

হিরণ্ময়ের তখন রীতিমত সঙ্কোচ, কেমন নার্ভাস লাগছে, সেজন্যেই খেয়াল করেনি। হোটেল ট্যাটখানা দেখে না জানি কি ভেবে বসবে।

ভুব বলতেই হল, এলি যখন, চল একটু চা খেয়ে যাবি। শুভার সঙ্গেও দেখা হবে।

—চল তবে। বিকাশও রাজি।

গাড়ি রাখার জায়গা না পেয়ে গ্যেটের সামনেই রেখে দিল বিকাশ।

আর বললে, আগের বাড়িটা ছাড়লি কেন?

সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে হিরণ্ময় উত্তর দিল, কুই তো জানিস, হোটেল ভাইয়ের সঙ্গে, মানে ওর বউ ছেলেমেয়ের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না—

উকিলের দোষেই হোক বা নিজের ভুলেই হোক ওকে যে বাড়িওয়ালার মামলা করে উচ্ছেদ করে দিয়েছে, সে কথা বলতে পারল না। আসলে ঐ খবরটা ও সকলের কাছ থেকেই গোপন রেখেছে। এই বাড়িওয়ালার কাছ থেকেও। জানলে কি আর ভাড়া দিত। ন্যায় হোক অন্যায় হোক, যে কোন কারণে একবার যে ভাড়াটেকে মামলা করে তুলে দিয়েছে, তাকে আর কেউ ভাড়া দিতে চায় না।

দালাল ছোকরাটি তাই হিরণ্ময়কে বারবার সাবধান করে দিয়েছিল, দেখবেন স্যার, ঝুগাকরেও যেন ল্যান্ডলর্ড জানতে না পারে। বলবেন, ভাইদের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না, আমি একটু শাস্তিতে থাকতে চাই।

একটু থেমে বলেছিল, দেখবেন বিশ্বাস করবে। বাঙালীর ঘরে এ তো হুমেশাই হচ্ছে।

কথাটা একেবারে মিথো নয়।

হিরণ্ময় সেই দালাল ছোকরাটির কথাই চালিয়ে দিয়েছিল।

ওরা ততক্ষণে তে-তলার সিঁড়িতে পৌঁছেছে।

বিকাশ বলল, কোন তলায় যে?

সকোচটা ঢাকা দেবার জন্যে হিরণ্ময় হেসে উঠল। বললে, চার তলা।

—চার তলা? বিকাশের গলায় কিম্বদন্তি ফুটল। বললে, রোজ হেঁটে উঠিস,

হেঁটে নামিস? লিফট নেই?

কিন্তু না ভেবেই বিকাশ বলেছিল। কিন্তু হিরণ্ময়ের শুনতে খারাপ লাগল।

হেসে বললে, আকাশের কাছাকাছি থাকা আর কি। মুক্ত বায়ু সেবন। মনে মনে ভাবল, হেসে হাস্য রসিকতা ছাড়া মৈন্য ঢাকবার আর কিই বা উপায়। অথচ হিরণ্ময়ের কোন মৈন্য আছে কে বিশ্বাস করবে। আশিসে জো সকলে শেষ জীবনের মাইনেটাই দেখে।

বিকাশকে দেখে শুভা তো অবাক। —মেয়ের বিয়ে নাকি? প্রশ্ন করল। নিজেই উত্তর দিল, তাছাড়া তো আপনার এ বাড়িতে আগার কথা নয়। হো হো করে হেসে উঠল বিকাশ। বললে, আমার তো মেয়ে নেই, ছুটেই ছেলে।

হিরণ্ময় কিছু বলল না। ও যে নিজেই এড়িয়ে গেছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে, বিকাশকে কোনদিন আসতে বলেনি, তা চেপে গেল।

বিকাশ ততক্ষণে বসার ঘরে ঢুকেছে, বসেছে। আর শুভা হাসিমুখে সামনে দাঁড়িয়ে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল ও খুব খুশি হয়েছে।

বিকাশ হেসে বললে, কিন্তু মশাই, রহস্যটা কি বলুন তো? বয়েসটা সেই একই জায়গায় আটকে রেখেছেন কি করে?

হিরণ্ময় হো হো করে হেসে উঠল।

অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে, বার তিনেক চা খেয়ে বিকাশ উঠল।

এতদিন পরে এসেছে, দরজা থেকে তো বিদায় দেওয়া যায় না, হিরণ্ময়ও সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল।

বিকাশ গাড়িতে উঠেছে, হিরণ্ময় তখনও দাঁড়িয়ে গল্প করছে, বাড়িওয়ালার বদমেজাজী ছেলেটা ছুটে এল।

হোটেলোকের মত হিরণ্ময়কে দীতমুখ খিচিয়ে বলে উঠল, এতক্ষণ কি ঘুমোচ্ছিলেন?

হিরণ্ময় জোর ধাক্কা খেল। অবাক হবার মতও মনের অবস্থা তখন নয়। ও ভাবতেই পারেনি বিশ-বাইশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে ওকে এভাবে অপমান করতে পারে।

ব্যাপারটি কি হিরণ্ময় বা বিকাশ কেউই তখনও বুঝতে পারছে না। বিকাশ শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে। গালে চিবুকে আধ-ইঞ্চি মাংসের দাড়ি নিয়ে রাগে মাখামাখি ছেলেটাকে দেখাচ্ছে তখন অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর।

হিরণ্ময় কোনক্রমে বললে, কি হয়েছে কি?

—কানে শুনতে পান না? ছেলেটা গর্জে উঠল আবার।

ওর ব্যবহারে হিরণ্ময় তখন এতটুকু হয়ে গেছে। এমনিতেই বিকাশের কাছে

ওর সঙ্গেচ এই পলি, এই ছোট ফ্ল্যাট, সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় ওঠার মৈন্য মনে করে। তার পরও বাড়িওয়ালার ছেলের এই ব্যবহার একজন বয়স্ক লোকের প্রতি। হোক না ভাড়াটে।

হিরণ্ময় বিকাশের মুহুর দিকে তাকাতে পারছিল না।

বিকাশই বাচাল। ও হেসে ফেলে জিগ্যেস করল, কি হয়েছে ভাই বলবে তো ?

বাড়িওয়ালার বীরেশ্বরবাবুকে বাইরে থেকে দেখলে তো সজ্জন বলেই মনে হয়। বেশ ভদ্র ব্যবহার। তাঁর এই জোয়ান ছেলে সোমনাথও কখনও এমন ভাবে হিরণ্ময়ের সঙ্গে কথা বলেনি।

বিকাশের হাসি দেখে, বিকাশের কথায় সোমনাথের গলার স্বর রাগের কাঁপুনি একটু নামল। বললে, গাড়িটা রেখেছেন তো গ্যেট আগলে, তখন থেকে হর্ন দিচ্ছি, শুনতে পাচ্ছেন না ?

কথাগুলো বিকাশকে উদ্দেশ্য করে, কিন্তু বলল হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে। সোমনাথ আরো একটু নরম হল; আঙুল দেখাল গ্যারেজের দিকে। বললে, আগধন্দী ধরে হর্ন দিচ্ছি, গাড়ি বের করার রাস্তা তো রাখবেন ? বিকাশ এবার লজ্জিত হয়ে পড়ল। হেসে হাস্য করার চেষ্টা করল। বললে, এত রাগ্নিরে গাড়ি সের করবে, ভাবিনি ভাই। হর্ন শুনতেও পাইনি।

দরজা খুলল। দরজা বন্ধ করল। স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল বিকাশ। হিরণ্ময় সম্পর্কে কি ভাবল কে জানে।

হয়তো চুকেবুকেই যেত। কিন্তু স্টার্ট দিয়ে তখনও বিশেষ এগোয়নি, সোমনাথ তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলল, গাড়ি থাকলেই ভদ্রলোক হয় না।

চিড়িক করে রাগ উঠে গেল হিরণ্ময়েব মাথায়। একটু অপেক্ষা করল, বিকাশ খানিকটা চলে যেতেই সোমনাথকে বলল, তোমার কথাগুলো কিন্তু ভদ্রলোকের মত ছিল না।

সোমনাথ রেসে গেল, হ্যাঁ ছোটলোক, তা হলে ছোটলোকের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আছেন কেন, ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে কঁচো হয়ে গেছে হিরণ্ময়। ওবার এই একটা মস্তুর সামনে বিবাক্ত সাপকেও নেতিয়ে পড়তে হয়। ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

রাগে গজগজ করতে করতে সোমনাথ চলে গেল। বলতে বলতে গেল, এত রাগ্নিরে গাড়ি বের করবে ভাবিনি, তুমিই বা এত রাগ্নিরে এসেছিলে কেন হে !

কথাটার কোন খোঁচা বা ইঙ্গিত আছে কিনা হিরণ্ময় ভাবেনি। তবু শুনতে

খারাপ লেগেছিল।

বিকাশ যখন এসেছে তখন বোধহয় রাত নটা। গ্যারেজে গাড়ি আছে, বেরোবে তা ভাববে কি করে। আর চারতলার ওপাশের বসার ঘরে বসে শুনতে পাবেই বা কি করে। এ গলিতে তো সবসময়েই হর্ন বাজছে। বাড়ির চেয়ে গাড়ির আনাগোনা বেশি। কে কাকে গাড়ি সরানোর জন্যে হর্ন দিচ্ছে বুঝবে কি করে।

তারপর থেকেই একটু একটু করে অসস্তাব শুরু হয়।

সে-সব দিনের কথা জুবলে এখন হিরণ্ময়ের হাসি পায়। প্রথম প্রথম বীরেশ্বরবাবুর কি ভদ্র ব্যবহার, বিনয়ী কথাবার্তা। তাঁর ছোট ছোট মেয়ে দুটির তো নিতা শুভার কাছে আনাগোনা। বীরেশ্বরবাবুর স্ত্রীও আসতেন। শুভাও কখনও কখনও যেত। হিরণ্ময়ের ছেলে কিন্তু আর মেয়ে ক্রমির মুখে তো সব সময় ওদের গল্প। রান্না করে মুড়িঘট পাঠিয়ে দিতেন বীরেশ্বরবাবুর স্ত্রী, মোচার চপ বানিয়ে শুভাও পাঠিয়েছে।

তারপর শোনা গেল সোমনাথকে হিরণ্ময় নাকি ছোটলোক বলেছে। বীরেশ্বরবাবু একদিন বললেন, হাসতে হাসতেই বললেন, রাগ্নিরে চোরছাঁড়ো ঢুকে পড়ছে, লছমনকে বলেছি নটা বাজলেই গ্যেটে তালা দিয়ে দেবে। হিরণ্ময় বিশ্বাসের চোখ তুলতেই সামান্য স্বরে বলেছিলেন, কেউ এলে গেলে লছমনকে বলবেন, ও খুলে দেবে।

তারও বেশ কিছুদিন পরে টিউবওয়েলেও চাবি পড়ল। দু'বাড়ির আনাগোনা আগেই বন্ধ হয়েছিল, দেখা হ'লেও আর কথাবার্তা হত না।

সব ভাড়াটেরা তখন একজোট হয়ে গেছে, কিন্তু অক্ষম। শুধু উত্তেজনাই বাড়ছে। উপায়ও নেই অন্য কোথাও উঠে যাবে। বাড়িতে ঢোকার সময়, বেরোনোর সময় প্রেসার বেড়ে যেত হিরণ্ময়ের। কারণ বাড়িওয়ালার তেতলার দরজা পার হয়ে ওকে চারতলায় যেতে হয়। চারতলা থেকে নামতে হয়।

সব সময় আতঙ্ক, কখন কি বলে বসে। কিছু একটা বলা মানেই সেদিনের জন্যে মেজাজ খারাপ।

মনটা বেশ ফুটি ফুটি ছিল। আপিস থেকে উমেশের সঙ্গে বেরিয়ে চীনে রেস্টুরেন্টে দিবা পেট ভরে খেয়েছে। আঃ, কতদিন পর চীনে খাবার খেল। প্যাকেট বেঁধে বাড়ির সকলের জন্যে আনতে পারল না বলে একটু যা মনের মধ্যে ঘিচঘিচ। ভালল, একদিন সবাইকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আনবে।

মিনিবাস থেকে ভিড় ঠেলে নেমে পড়তেই সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল।

ভ্যাপসা গরম আর ঘামের গন্ধে এতক্ষণ বোকাই যায়নি বাইরে এমন শরীর জুড়োনো ঠাণ্ডা, এমন দ্বিধা বাতাস।

পীঠে মোড়া চওড়া রাস্তা ধরে হাওয়া খেতে খেতে হেঁটে এসে বাঁদিকে বীক নিতেই গলিটা। খোয়া ছড়ানো উঁচু নিচু। এখানে এসেই মন ঝুঁকড়ে যায়। দুপাশে তো এত নতুন নতুন বাড়ি, সবাই মিলে রাস্তাটাকে তো ভাল বানাতে পারত। অজন্ত দূরমুখ পিটিয়ে হেঁটের টুকরো রাবিশ ঢালা রাস্তাটাকে হাঁটাচলায় উপযোগী করা যেত। কিন্তু কেউ করবে না। সকলেই বসে আছে। কবে কর্পোরেশন করে দেবে। কর্পোরেশনও তেমনি, দুটো বাল্ব জ্বালিয়ে, দুটো জলের পাইপ দিয়ে দায় সারছে, ট্যাক্স নিচ্ছে। বাল্ব জ্বলে না, জল আসে না।

যাক, গোটটা এখনও খোলা, যদিও নটা বেজে গেছে।

গোট বন্ধ করার একটা কারসাজি আছে, সেটা লছমনকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে। এসময় পুরোনো ভাড়াটেনের কারো অতিথি এলে, কিংবা বাড়ির লোক বাইরে থাকলে তবেই তালা পড়ে। অতিথির বেরোনোর সময়, কি বাড়ির লোকের ঢোকান সময় লছমনকে ডেকে ডেকে হয়রান হতে হয়, তখন আর তার পাস্তা পাওয়া যায় না। যিনি বেড়াতে এসেছিলেন, কি নেমস্তম্ভের কার্ড দিতে, তাঁর সামনে অপদস্থ হও।

এমনিতেই মনটা খুশি খুশি ছিল, গোট খোলা পেয়ে আরো ভাল লাগল। শুধু ক্লান্তি লাগে, আবার সেই চারতলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে ভেবে। আর বাড়িওয়ালার তেতলার দরজা পার হতে হবে।

নাঃ, দরজাটা বন্ধই।

চারতলায় উঠে এসে কলিং বেল-এ আঙুল টিপল। কুর-র আওয়াজ শুনতে পেল। কিন্তু অপেক্ষা করেও কেউ এল না।

আবার বাজাল।

এবার খুঁট করে খিল খোলার আওয়াজ।

কপাটে ঠেলা দিয়ে ভিতরে ঢুকল হিরণ্ময়। শুভাই দরজা খুলেছে। খুলে এক মুহূর্ত হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আর শুভার সেই মুখের দিকে তাকিয়ে হিরণ্ময়ের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

থমথমে মুখ শুভার। যেন কিছু একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। চোখ স্থির। কিন্তু একটু নেড়ে দিলেই যেন চোখ থেকে জল ঝরে পড়বে।

হিরণ্ময়ের দিকে যেন তাকাতেই পারল না শুভা। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত

রাস্তাঘরের দিকে চলে গেল।

হিরণ্ময়ের বুকের মধ্যে তখন তোলপাড়। কি হয়েছে? কিছু কি হয়েছে? প্রশ্ন করতেও পারল না ও, তার আগেই শুভা চোখের সামনে থেকে সরে গেছে।

মুখের দিকে তাকিয়ে ঐ কয়েক মুহূর্তের জন্যে বেটুকু দেখেছে, মনে হল সাজঘাতিক কিছু ঘটে গেছে। কোন সমূহ বিপদ।

॥ দুই ॥

খুশি-খুশি ভাবটা কোথায় উবে গেছে। একটা অদম্য উৎকণ্ঠা নিয়ে শোয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল হিরণ্ময়। বুকের মধ্যে একদিকে উৎকণ্ঠা, আরেকদিকে চাপা বিরক্তি।

অজুত চাপা স্বভাব শুভার, এত বছর পরেও বদলাতে পারল না। অসুখবিসুখ হলে কষ্ট পাবে, যন্ত্রণা সহ্য করবে, তবু মুখ ফুটে বলবে না। জানতে চাইলেও এড়িয়ে যাবে। বাড়িতে কিছু ঘটলে তখন তখনই জানাবে না। স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের কোন খারাপ রিপোর্ট এলে নিজেই গিয়ে ব্যবস্থা করে আসবে।

হিরণ্ময় আপিসের পোশাক ছেড়ে পাজ্যামায় পা গলিয়ে কলঘরে গিয়ে ঢুকল। হাতমুখ ধুয়ে এসে খাটের ওপর বসল। তার পরই লক্ষ করল টিভি চলছে না। এ সময় তো শুভা বসে বসে টিভি দেখে। আজ্ঞা আর চালায়নি নাকি!

উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল। একটু রাগও হল শুভার ওপর। কি হয়েছে বলবে তো।

চুপচাপ বসে রইল, শেষে নিজেই উঠে গিয়ে টিভিটা চালিয়ে দিল। সাউন্ড কমাল। পাশের ঘরে বিন্টু আর রুমি হয়তো পড়ছে, ওদের পড়ায় মন বসবে না। বিন্টু এবারই পাটওয়ান দেবে; রুমি পাট টু।

হিরণ্ময় একটু বেশি ব্যয়েসেই বিয়ে করেছিল, ছেলেমেয়ে এসেছে আরো দেরিতে। সেজন্যেই রিটার্নারমেন্টে এত দুর্ভাবনা। চাকরি থাকতে থাকতে ওরাও যদি মানুষ হয়ে যেত, মেয়ের যদি বিয়ে দিয়ে দিতে পারত।

কিন্তু শুভা আসছে না কেন?

একবার ভাল গলার স্বর উঁচিয়ে বলে দেবে, খেয়ে এসেছি। শুধু চা দিস রে যমুনা।

কিন্তু শুভার ধমধমে মুখটা তখনও চোখের ওপর ভাসছে, তাই বলতে পারল না।

মনে মনে খুঁজে বের করতে চাইল কি ঘটতে পারে। বাড়িওয়ালাকে নিয়ে

আবার কিছু ঘটল নাকি?

কই, যমুনা তো চা নিয়ে এল না।

ভাড়াভাড়ি রান্না সেয়ে নিয়ে এ সময় যমুনাও এসে মেঝেতে বসে টিভি দেখে। টি ভি দেখার সময় ওকে নড়ানো যায় না। শুভা কোন ফাইফরমশ করলে গ্রাহ্যই করে না। মেয়েটা কাজের। ওর রান্নার হাতও ভাল। সারাদিন হাসিমুখে খাটাখাটনি করে। কোন বিরক্তি নেই।

কিন্তু হিরণ্ময় ফিরে এলেই টি ভি দেখা ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে চা আর খাবার করে নিয়ে আসে।

যমুনার ওপর এখন মায়া পড়ে গেছে হিরণ্ময়ের। শুভার তো আরো বেশি। অঞ্চ প্রথমে হিরণ্ময় আপত্তি করেছিল।

তখনও যমুনাকে চোখে দেখিনি। দেখলে হয়তো কিছুতেই রাজি হত না।

এই ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর কাজের লোক কতবার যে বদল হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই বাড়ির ছ ছটা ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরাই নয়, পাড়ার লোকরাও যেন ওত পেতে থাকে কাজের লোক ভাঙিয়ে নেবার জন্যে। যে-কোন একটা বাড়ির কাজের লোক ছেড়ে গেলেই, কিংবা দু'মাস ছুটি নিয়ে দেশে গেলেই সকলে তটস্থ হয়ে ওঠে। পাঁচ দশটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে কে যে কাকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

প্রথমে মাধব বলে একটা বাচ্চা ছেলে ছিল।

সে একদিন কাজ করতে করতে শুভাকে বললে, পালবাবুদের বাড়ি হপ্তায় দু'দিন মাংস হয়।

শুভা খুব চটে গিয়েছিল। ও বুঝতেই পারেনি জ্বলেটা কি বলতে চায়। রেগে গিয়ে বলেছিল, খবদারি অন্যের বাড়ির কথা বলবি না। আমি ওসব একদম পছন্দ করি না। কারো হাড়ির খবর জানার আমার দরকার নেই।

শুনে হিরণ্ময়ের নিজেও খারাপ লেগেছিল। ওর মনে হয়েছিল মাধব বলতে চাইছে, এ বাড়িতে ও ভাল খেতে পায় না। কিংবা পালবাবু আনেক বড়লোক, ওদের বাড়ির চাকরটা খুব মাহ্ মাংস খেতে পায়।

শুভা রেগে গিয়ে বলেছিল, কোন বাড়িতে রোজ মাহ্ খেতে দেয় রে।

কিন্তু ব্যাপারটা বোঝা গেল দিনকয়েক পরেই। মাধব মাইনে নিয়ে শাটটা কাঁধে ফেলে চলে গেল। —আমি আর কাজ করবনি।

পরে জানা গেল দশটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে পালবাবু তাকে ভাঙিয়ে নিয়েছেন। নিজের বাড়ির জন্যে নয়। স্ট্র লেকে তাঁর মেয়ের বাড়ির জন্যে।

তখন অনুশোচনা, মাথার ওপর রাগও। —মাইনে বেশি দিচ্ছে বললেই তো পারত। আমরাও বাড়িয়ে দিতাম।

হিরণ্ময় হেসে বলেছিল, তা' দিতে না। বললে, বিশ্বাসই করতে না। শুভা রেগে গিয়েছিল, আমার দিতে আপত্তি হবে কেন, তুমি দিতে পারলেই হল। তখন তো বলতে, চাকরের জন্যে এত লাগছে এত লাগছে।

এই এক জায়গায় হিরণ্ময় চুপ।

তারপর যতদিন নতুন লোক না পাওয়া গেছে, সে কি অশান্তি। হিরণ্ময়কেও খোঁজাখুঁজি করতে হয়েছে, আপিসের পিওনকে বলেছে, দুখ আনতে গিয়ে রাস্তায় অচেনা কোন কাজের মেয়েকে ধরে বসেছে, একটা লোক দিতে পারো? —ঠিকে?

হিরণ্ময় বলেছে, না না, ঠিকের লোক আছে। চাক্ষুশ ঘন্টার, বাড়িতে থাকবে। রামা না জানলেও হবে, শিখিয়ে দেব।

সে হাত নেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ সেও ঠিকের কাজ করে। বলেছে, আমার মেয়েই তো আছে, কিন্তু ঠিকের কাজ করবে। বাড়িতে কে থাকবে বাবু, ভোর পাঁচটায় ডেকে তুলে দেবে, আর রাত বারোটায় ঘুমোতে যাবে। পাঁচ বাড়িতে কাজ করলে আড়াইশো টাকা।

শুভা তো সর্বকণ্ঠ চারতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। কাজের লোক দেখলেই মিষ্টি হেসে তাকে ডাকছে। হেসে হেসে বলছে, একটা লোক আছে জেঁমার খোঁজে? কিংবা একটা কাজের লোক দেখে দাও না গো। যেন অচেনা সেই ঠিকে কি-টা কতদিনের চেনা। কথা বলতে বলতে জিগোস করে, চা' বাবে?

আপিসের উম্মেশ রসিকতা করে বললে কি হবে, পরম সত্যবাক্যই উচ্চারণ করেছিল। সব ডিভোর্সের মূলে নাকি কাজের লোক, কি-চাকর থাকলে তবেই সংসারে শান্তি বজায় থাকে।

শুভার মেজাজ তখন সব সময়ে সপ্তমে চড়ে আছে। হিরণ্ময় কিছু জিগোস করলে সাড়াও দেয় না। বড়ো জোর হ্যাঁ বা না।

সারাটা জীবন তো এভাবেই চলে এসেছে, অসন্ত বিবাহিত-জীবনের এতগুলো বছর। একটা গেছে। আরেকটা এসেছে। মাঝখানের দিনগুলো কি অশান্তি। কি অশান্তি। অথচ শুভা তো পারে পা দিয়ে খাটের ওপর বসে থাকে না। সেও সমানে খাটছে। সংসারে এত কি খাটাখটুনির আছে হিরণ্ময় বুঝতেই পারে না।

শেষ অবধি একটা কাজের মেয়ে পাওয়া গিয়েছিল।

শুভা বলেছিল, বাচ্চা চাকরে আমার কাজ নেই। চোরছাচোড় হয়, কথা মানে না, তার ওপর অন্য বাড়ির চাকরদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। কোথায় দুটাকা মাইনে বেশি পাবে খোঁজ করে।

সেই প্রথম মেয়ে ঢুকল। একটা বাচ্চা মেয়ে, ভালো করে ইজেরে স্টিট দিতে পারে না। সেও বোধহয় বছর দুই ছিল। তারপর একটা গেছে, আরেকটা এসেছে। কেউ কেউ তিন চার বছরও টিকে গেছে। ক্রমি যখন ব্যালান্স ছিল তখন দিবা বন্ধ হয়ে যেত, একসঙ্গে গল্প করা, দুডো খেলা, হাসাহাসি, মৌড়ঝুপ। হিরণ্ময়ের মনে হত ক্রমির মায়াতেই টিকে থাকছে।

কিন্তু ক্রমি বড় হয়ে যাওয়ার পর আর মেলামেশা করত না। বরং দাপটে রাখত, স্বকুম করত।

এতকাল কম বয়েসী কাজের মেয়ে পাওয়া যাচ্ছিল। পার্বতীর তখন কতই বা বয়েস, বারো কি তের, রোগা রোগা চেহারার জন্যে আরো কম মনে হত। ওর বাবা এসে নিয়ে চলে গেল, মেয়ের বিয়ে দেবে। মাস কয়েক আগে দেশে গিয়েছিল দিন পনেরোর ছুটি নিয়ে। ফিরে এসে কিছু বলেনি।

দুম্ করে একদিন ওর বাবা এসে হাসতে হাসতে বললে, পার্বতীকে নিয়ে যাবো মা, এই অস্থানে ওর বিয়ে।

এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কথা যেন আর নেই।

শুভার তখন মাথায় বজ্রাঘাত।

হিরণ্ময় বোঝাবার চেষ্টা করল, এত কম বয়েসে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আইন আছে, ধরা পড়লে জেল হয়ে যাবে।

পার্বতীর বাবা লাল ছোপ লাগা অঁকাবঁকা দাঁত বের করে হাসল। বললে, গায়ে কি আর আইন আছে বাবু, ওসব আপনাদের নেসে।

হাসতে হাসতে বললে, গায়ে পাড়াপড়শীরাই আইন।

শেষ অবধি ছেড়ে দিতেই হল। আর পার্বতী চলে যাওয়ার পর একেবারে অন্ধকার।

লোক আর পাওয়া যায় না।

শুভা একজনকে ধরেছিল, জোগাড় করে দেবার জন্যে। সে মুন্সের ওপর বলে দিয়ে গেল, কোথায় পাবো, আপনাদের তো হাজার রকম ফরমাশ।

শুভা বললে, ফরমাশ আবার কিসের?

সে ঝী ঝী করে বললে, বেশি বয়েস হবে না, বাচ্চা চাই, নোংরা হবে না, আবার হিটিং ফিটিং চলবে না। চটপটে...

কাজের মেয়ে রাখা সত্যি বড়ো আমেলার ব্যাপার, অথচ না থাকলে
মধ্যবিস্তার সংসার অচল।

হিরণ্ময়ের নিজেরও কোন হিসেব ছিল না। শুভা একদিন হঠাৎ বললে,
দু'মাস হয়ে গেল তার খেয়াল আছে?

একটু থেমে বললে, দু'মাস ধরে রান্না করছি।

হিরণ্ময় প্রথমটা বুঝতে পারেনি, বুঝতে পেলেই রসিকতা করে বললে,
সেজন্যেই শরীরটা ভাল যাচ্ছে, ক্ষিদেও বেড়েছে।

শুভা হাসল না, শুধু বললে, কাল থেকে হোটেলের ব্যাক্সা করো।

আসলে রান্নাটা শুভা একেবারেই নাকি পছন্দ করে না। বিয়ের পর থেকেই
শুনে আসছে হিরণ্ময়। কাজের লোক থাকলে তাকেই শিখিয়ে পড়িয়ে নেয়।
কিন্তু হিরণ্ময় দেখেছে, শুভা সর্বক্ষণ রান্নাঘরেই। ঠিক মত পারছে না ভেবে,
প্রায়ই তাকে বলে, সর সর, আমিই করে নিচ্ছি।

কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে খাবার জল আনা।

আগের বাড়িতে কাজের লোককে দিয়ে রান্নার টিউবওয়েল থেকে কলসী
করে জল আনাত। এই ফ্ল্যাটে উঠে এসে একটা সুবিধে হয়েছিল। বীরেশ্বরবাবু
হয়তো নিজের পানীয় জলের প্রয়োজনে একটা টিউবওয়েল বসিয়েছিলেন
গ্যারেজের পাশে। শুধু এ বাড়ির ভাড়াটেরাই নয়, পাড়া-পড়শীরও অনেকে ঐ
টিউবওয়েল থেকে জল নিত। সকালের দিকে তো সারাঞ্চনই হটাৎ হটাৎ
চলত।

কিন্তু চারতলায় কলসী-ভর্তি জল তোলা সে এক সমস্যা। কাজের লোক না
থাকলে অসুবিধের একশেষ।

হিরণ্ময় বলেছিল, একটা ওয়াটার-ফিলটার কিনে নিই, কি বলো।

শুভা বলে উঠেছিল, পাগল হলে নাকি? ঐ পাম্পের জল মুখে তোলা যাবে
নাকি? মুখ ধোবার সময় দেখো না, কি নোনা কি নোনা।

হিরণ্ময় আপত্তি শোনেনি, বলেছে, বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়িগুলোতে সকলে ঐ জলই
ফিলটার করে খায়।

শুভা বলেছে, হ্যাঁ সেও খেয়েছি দিদির বাড়িতে গিয়ে, সেও মুখে তোলা যায়
না। তাছাড়া ওদের তো ডীপ টিউবওয়েলের জল।

কোনটা ডীপ আর কোনটা নয় সে তত্ত্ব অবশ্য হিরণ্ময়ের জানা ছিল না।

বেশ বুঝতে পারল শুভা এতদিনের অভ্যাসটা বদলাতে রাজি নয়।

শুভা নিজেই আপত্তিটা কেন তা বুঝিয়ে দিল। —দুপুরবেলা রোদগরমে

গিয়েছি দিদির ফ্ল্যাটে, জল চাইলাম, ফ্রিজের জল মিশিয়ে দিল, তেঠায় গলা
শুকিয়ে কাঠ, এক চৌক খেয়ে জল আর গলা দিয়ে নামতে চায় না। বিস্বাদ।
'বিস্বাদ' কথাটা এমন মুখ বিকার করে বলল, যেন পৃথিবীতে ওর চেয়ে
খারাপ জিনিস আর কিছু নেই।

ফলে কেবল এ ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাটের কাজের লোকদের পাকড়াও করে, আর
অমায়িক হেসে হেসে বলে, এক কলসী জল এনে দেবে ভাই, নীচের টিউবওয়েল
থেকে।

অমায়িক হাসি আর অন্তরঙ্গ ভাবটাই যথেষ্ট নয় জেনে সঙ্গে সঙ্গে বলে, একটা
টাকা দেব।

এভাবেই চলছিল, একদিন হিরণ্ময় সদা আপিস থেকে ফিরেছে, শুভা চা আর
কুটি তরকারি নিয়ে এসে বেশ হাসি হাসি মুখে বসল খাটের অন্য প্রান্তে। ফুটি
ফুটি ভাব। অনেকদিন এ-রকম দেখেনি হিরণ্ময়।

তারপর শুভা খুশি খুশি মুখে বললে, সুখের আছে। একটা জুটেছে, কাল
আসতে বলেছি।

একটু থেমে বললে, কিন্তু পার্বতীকে যা দিতাম তার চেয়ে কুড়ি টাকা বেশি
লাগবে। তার কমে কিছুতেই ওর বাবা রাজি হল না। লোকটা খুব ঘোড়েল।

একটু থেমে আবার বললে, ওরা সব পাড়ার ঝিগুলোর সঙ্গে মিটিং করে
মাইনে ঠিক করে আসে, বুঝলে না? কমে পাবে কি করে!

তখন আর মাইনেটা বড় কথা নয়, লোক পাওয়াই যথেষ্ট।

বাড়ছে, বাড়ছে, বাড়ছে। সব দিকেই খরচ বাড়ছে। জিনিসের দাম বাড়ছে।
অথচ মানুষকে সং থাকতে হবে। এই রোজগারেই চালাতে হবে। সেজন্যেই
রিটারায়মেন্টের কথা ভাবলে হিরণ্ময় কিস্তি বোধ করে।

উপায় নেই দেখে বললে, তাই দাও, আর কি করবে। পরের মাস থেকে তো
ইলেকট্রিকের বিলও বাড়বে। লোডশেডিংও বাড়ছে বিলও বাড়ছে।

'তাই দাও'। এই একটা কথাতেই শুভা দারুণ খুশি। ও ওসব ভবিষ্যৎ ভাবে
না, বর্তমান নিয়েই মশগুল।

উঠে গিয়ে কি একটা কাজ সেরে এল শুভা। ফিরে এসে বললে, বাচ্চা মেয়ে
কিন্তু পাওয়া গেল না, এর বয়েস একটু বেশি। বোধহয় ষোল সতেরো, তবে
বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখে তো মনে হল খুব চটপটে।

—ঘোল সতেরো। খটকা লাগল হিরণ্ময়ের।

এতক্ষণ হিরণ্ময়ও খুশি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বয়েসটা শুনেই আপত্তির

ভঙ্গিতে বললে, এ-সব ব্যয়সের মেয়ে না রাখাই ভাল, দায়িত্ব বেড়ে যায়।
তা শুনে শুভার প্রচণ্ড রাগ। বললে, তা হলে এভাবেই চলবে নাকি ? না
পেলে কি করব।

—তবে রাখো। এ ছাড়া আর কি বলবে হিরণ্ময়।

জিগেস করল, বিয়ে হয়নি ?

আপত্তি করেছে বলেই শুভা তখনও বিরক্ত, কিংবা আপত্তিটা ওর নিজেরও
ছিল, চাপা দিয়ে রেখেছিল, হিরণ্ময় মনে পড়িয়ে দিয়েছে বলেই বিরক্তির স্বরে
বললে, কি করে জানব ? সিঁদুর তো দেখলাম না, জিগেসও করিনি।

একটু পরে বললে, হয়তো স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে। ওদের তো ঐরকমই
হয়।

হিরণ্ময়ের একটু রসিকতা করে ব্যাপারটা হ্যাঁকা করার ইচ্ছে হল, বললে, হ্যাঁ,
ওদের ঐরকমই হয়, আমাদের হলে তাড়ায় না, পুড়িয়ে মেরে দেয়।

পরের দিন আগিস থেকে ফিরে হকচকিয়ে গেল।

রাগাধরের সামনে এক ফালি বারান্দা আছে। পাশেই কলঘর।

সেদিন প্রচণ্ড গরম। বাসের ভিড়ে চিড়েচ্যাঁটা হয়ে ঘেমে নেয়ে ফিরেছে।
তাড়াতাড়ি পোশাক ছেড়ে তোয়ালে নিয়ে স্নান করার জন্যে কলঘরে ঢুকতে
যাবে, ধমকে থেমে পড়ল।

সিমেটের মেঝের ওপর ঝড়ি দিয়ে বাঘবন্দী খেলার ছক আঁকা, কি একটা
ছুটি নিয়ে নিজে নিজেই লোফালাফি করছে, চাল সিঁছে একটা মেয়ে। বছর বোল
সত্তরো হবে, কি আরো বেশি।

সরল গ্রাম্য মেয়ে। পলিমাটির মত গায়ের রঙ, বড় বড় নির্বোধ চোখ মেলে
অবাক হয়ে হিরণ্ময়ের দিকে তাকাল। তারপর কি মনে হতে ঝট করে উঠে
দাঁড়িয়ে পিছনে হাত লুকোল। অর্থাৎ ছুটিটা লুকিয়ে ফেলল। যেন কত বড়
অন্যায় হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে ভয়। তাকাতেও পারল না, মাথা নিচু
করল।

কলঘরে ঢুকে গেল হিরণ্ময়, কপাটে ঝিল দিয়ে শাওয়ারের চাবি ঘোরাল।
কিন্তু ছবিটা তখনও চোখে লেগে রয়েছে। একটা আধ-ময়লা ছাপা শাড়ি, হাত
বোধহয় কাচের কিংবা প্লাস্টিকের চুড়ি কয়েক গাছ। কোমর অবধি চুলের ঝল
নেমেছে। একেবারে গ্রাম্য সরল, একটা আলগা শ্রী আছে চোখেমুখে, শরীরে।

তখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেনি হিরণ্ময়। স্নান সেরে তোয়ালেতে মাথা
মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল, আর সঙ্গে সঙ্গে বেশ হাসি হাসি মুখে শুভা বলল, এসে

সেছে।

—ই। একটু থেমে হিরণ্ময় বললে, কি নাম কি ?

—যমুনা।

হিরণ্ময় আবার বললে, ই।

তারপর ধীরে ধীরে আপত্তি জানাল, কাজটা বোধহয় ভালু করল না।

—তোমার তো সবচেয়েই আপত্তি। লোকে ঐ ব্যয়সের মেয়ে কি রাখছে
না ? না রাখলে ওরাই বা যাবে কোথায় ?

হিরণ্ময় এর আগে শুধু ব্যয়স শুনেই অসম্মতি জানিয়েছিল। এখন সে
আপত্তি আরো বেশি মেয়েটার দিবা সূত্রে চেহারা দেখে। ঐ ময়লা শাড়ি আর
কাচের চুড়ি বিশেষ দিয়ে কমির পুরোনো শাড়ি পরলে ওকে কাজের মেয়ে বলে
বিশ্বাসই হবে না।

শুভাই সে-কথা বলল।—জানো, ওদের অবস্থা নাকি ভালই ছিল, পরের
জড়িতে ঝি-গিরি কখনও কেউ করেনি। বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করত, তাহা
থেকে পড়ে গিয়ে খোঁড়া হয়ে গেছে।

বেশ বোকা গেল মেয়েটার ওপর ইতিমধ্যেই মায়া পড়ে গেছে শুভার।
হিরণ্ময়েরও এখন আর তাড়াতে ইচ্ছে করছে না।

হিরণ্ময় বলতেও পারল না, তার আপত্তি শুধু ব্যয়সের জন্যে নয়, মেয়েটা
বড়োবেশি সূত্রে। একটা আলগা শ্রী আছে।

ঐ ব্যয়সের একটা মেয়েকে, বিশেষ করে কাজের মেয়েকে হিরণ্ময়ের চোখে
সুন্দর লেগেছে এমন কথা শুনেও হয়তো খারাপ লাগবে শুভার। কিন্তু একটা
বলে বসবে কি না কে জানে। তাড়াতে তো পারবে না বুঝতেই পারছে, ওসব
বললে উল্টে হয়তো সন্দেহ করে বসবে। ছায়ায় বছর ব্যয়সের হিরণ্ময়ের তো
ওর চেহারার দিকে, মুখের দিকে তাকাবার কথা নয়। তাকালেও তাকে সূত্রে
লাগবে কেন ?

শুভা আবার বললে, দেশেগায়ে ওদের জমিও ছিল। বাবার রোজগারও
ছিল। মাও এসেছিল ওর, কি কান্দছিল কি বলবে। ওর বাবা আর তারায় উঠতে
পারে না বলে কাজ পায় না, বসে বসে খেয়েছে এতদিন, তাই জমিগুলোও সবই
প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে।

শুনে হিরণ্ময়ের মনেও একটু সমবেদনা জাগল।

কোন্ডের স্বরে বলল, আমাদের দেশে এ-ছাড়া আর কি হবে। বীরেশ্বরবাবুরা
কোন্ডাকাতা জুড়ে একটার পর একটা প্যালেস বানাতে, তেরতলা ফ্ল্যাটবাড়ি

উঠবে, আর যারা বনায় তাদের বাড়ির এই বয়েসের মেয়েরা শেষে কি-গিরি করতে আসবে। শালার ডেমোক্রিসি।

রাগটা সমাজের বিরুদ্ধে না বাড়িওয়ালা বীরেশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে, হিরণ্ময় নিজেরও বৃদ্ধিতে পারল না। নাকি আসলে যমুনা না কি নাম, ঐ সুখী মেয়েটার ওপর সম্মেলন।

পরকালেই হেসে ফেলল কল্লো, ভাগ্যিস তারা থেকে পড়ে গিয়ে ওদের ঠাং ভাঙে, তা না হলে তো কাজের মেয়ে পেতে না।

চল পা গলাতেই বলল, তবু শুভা বলে উঠল, আঃ, আঃ। শুনেতে পাবে। সেই সময়েই যমুনা ঢুকল মাথা নিচু করে, হিরণ্ময়ের জন্যে রুটি নিয়ে। শুভা বলে উঠল, বাঃ রে যমুনা, তুই তো খুব কাজের মেয়ে, ঠিক মনে রেখেছিস।

হিরণ্ময়কে বললে, দেখেছো, সেই সকালে বলেছি বাবু এসে রুটি খায়, ঠিক মনে রেখেছে। সেটা ছালাতে শিখে গেছে, সিলিভার বন্ধ করতেও।

শুভা বললে, চল, চা বানানো শিখিয়ে দিই।

যমুনা মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ল, চলে গেল।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ল, কুড়ি টাকা বেশি চাইছে বলে শুভা বলেছিল, বাবাটা যোকেল, কিছুতেই কমে গাজি হল না। অথচ এখন মেয়েটার গুলগানে পঞ্চমুখ। এখন আর কোন কোভ নেই, যমুনার বাবার জন্যে এখন সহনুভূতি। কারণ মেয়েটা কাজের।

বীরেশ্বরবাবু প্যালেস বনায় আর রাজমিস্ত্রির মেয়েকে কি-গিরি করতে হয়। নিজের কথাটাই আবার মনে পড়ে যেতে হিরণ্ময়ের হাসি পেল। আপিসের উমেশ এখনও পুরোপুরি বুজোঁয়া। কিন্তু সূধাকান্তর কথা শুনে শুনে ও নিজেরও কি বদলে যাচ্ছে নাকি? সূধাকান্ত একটু ইউনিয়ন টিউনিয়ন করে, পরম গরম কথা বলে, তার বয়েস কম। কিন্তু রিটার্নমেন্ট এগিয়ে আসছে বলে হিরণ্ময়ও বোধহয় ওর মত হয়ে যাচ্ছে। তা না হলে কোথায় কোন রাজমিস্ত্রির পা ভেঙেছে তার সঙ্গে বীরেশ্বরবাবুর কি সম্পর্ক!

বাড়িওয়ালায় বিরুদ্ধে রাগটা বাড়ছে কেন তা হিরণ্ময় বোঝে। আসলে গত মাসে বীরেশ্বরবাবু সব ভাড়াটীদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রীতিমত স্ট্রীটিং। জমিদারবাবু যেন প্রজাদের ডেকেছেন। কর্পোরেশনের বিলগুলো সামনে রেখে ধরে কল্লো, ট্যাক্স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, আপনারা এ-মাস থেকে একশো টাকা করে ভাড়া বাড়তে হবে।

দু'একজন সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

যারা রাজি হল না তাদের দলে হিরণ্ময়। বীরেশ্বরবাবুর কথায় বৃদ্ধি ছিল ঠিকই, হিরণ্ময় নিতে পারত না তাও নয়। ওর ভাব অন্যর। এখন চাকরি আছে, একটু টানাটানি হলেও নিতে পারবে। কিন্তু রিটার্নমেন্টের পর? তখন তো এই ভাড়াটা শুনেই কষ্ট হবে। এর ওপর আবার বাড়তি ভাড়া! জমিদার বানার্জিবাবু তো বলতই বসলেন, আইন কি বলে আগে দেখি, তারপর। যার যেদিকে সুযোগ আছে তার সদ্ব্যবহার করতে কেউ ছাড়ে না।

ফল হল এই, টিউবওয়েলে চাষি পড়ল।

বানার্জিবাবুই আপত্তি করতে গিয়েছিলেন।—জল সেবেন না মানে? জানেন, ওটা ক্রিমিনাল অফেন্স?

উনি কেবল আইনের রাজ্য যান।

আইন না দেখিয়ে কাচুমাচু মুখে বললেই তো হত, আপনি বড়লোক, আপনার আর এ টাকায় কি হবে। আমাদের কোন রকমে সংসার চলে, নম্মা করে...

মদ্য করত কি না করত কে জানে, তবে আত্মসম্মানে লিপ্ত বৈকি। প্রজা যেন জোড়হাত করে বলছে, জমিদারবাবু, এ বছরটা স্বাধীনতা মকুব করে দিন।

আত্মসম্মান। আত্মসম্মান বজায় রেখে বাঁচার উপায় আছে? চুরিজোজুরি করে, খুস নিয়ে, ট্যাক্স ফাঁকি নিয়ে তবেই মানুষ এ-যুগে বাঁচতে পারে।

আইনের কথা শুনেই বীরেশ্বরবাবু বললেন, জল বন্ধ করব কেন? পান্ডিত্য জল তো আপনারা পানচ্ছেন। টিউবওয়েলের জল সেওয়ার তো কথা নয়, ঝট্টা তো আমার নিজের জন্যে।

তারপর হেসে বললেন, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। ভাড়া বাড়াননি বলে টাইট দিচ্ছি না।

কপাটা কানে অস্বীল শোনাল। অভ্যস্তোচিত।

বীরেশ্বরবাবু বললেন, এতদিন তো দেখেছেন, পাড়াপড়শীকেও জল দিয়েছি। জল দেয়ার মত পুণ্যকাজ আর নেই।

একটু থেমে বললেন, কিন্তু সারাদিন ধরে কনের কাছে হটাং-হটাং আওয়াজ, সারাক্ষণ উঠোনে জল সপসপ, লোকে জল ফেলতে ফেলতে যায়, বেশ তো, আপনারাও জল নটা থেকে দশটা, এক ঘণ্টা খোলা থাকবে।

সকলে খুশি হয়ে ফিরে এসেছিল।

যার হাতে যেটুকু খুজি, সে সেটুকুই মূলধন করে কাজে লাগায়।

নটি থেকে দশটি। এক ঘন্টা হিসেব করে জল আনা সহজ নয়।

কিন্তু ব্যাটা লছমন—

বিহঙ্গি ছোকরা লছমন বীরেশ্বরবাবুর পেয়ারের চাকর না দারোয়ান বোকা নয়। সর্বকণ বগলে একটা ট্রানজিস্টর রেডিও, উচ্চৈশ্বরে খিদি গান বাজছে। ছোপাটপ জামা পরে, কায়দা করে টেরি কাটে খিদি সিনেমায় নায়কের অনুকরণে। হয়তো ভেতরে ভেতরে খিদি স্টার হবার বাসনাও আছে। চেহারাটাও খারাপ নয়।

ছোকরার ভাবভঙ্গি এমন ফেন সেই বাড়িওয়াল। ঘড়ি ধরে নটার সময় টিউবওয়ালে চাবি খুলে দেয়, দশটির সময় বন্ধ। কেউ না থাকলে দশটার আগেই চাবি লাগিয়ে দিত। তা নিয়ে নিত্যদিন কাজের লোকদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি। হুটপোল। শেষ অবধি তার বাবুকে ডেকে আনত সে। কিন্তু তাঁকেও যে ও সমীহ করত তা নয়।

তার কলে মিষ্টি হেসে মিষ্টি কথায় লছমনকে হাত করার চেষ্টা করত সকলেই। হিরণ্ময় আর শুভাও।

জোবাসোথে কে না ভেজে। বাড়িওয়ালার সম্মতি থাক বা না থাক, লছমন মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে, কি সন্ধ্যার পর কিছুকণ চাবি খুলে দিত।

আসলে রাস্তার টিউবওয়ালে থেকেও আনা যায়। কিন্তু সেটা অনেক দূরে, কাজের লোকরা অত দূর থেকে কলসী ভর্তি জল আনতে চাইত না। তারা বিগড়ে গেলে তো সমূহ বিশ্র। তার ওপর রাস্তার টিউবওয়ালে ভারীসের ভিড়, সেখানে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। সেখানে পাঠালে সারা বেলা কাবার করে কিরবে। হয়তো আড্ডা দিয়ে।

আড্ডাকে বড়ো ভয় শুভার।

একদিন সোকান থেকে কি একটা আনতে পাঠিয়েছিল, সেবি করে ফিরেছে যমুনা। শুভার সে কি বকুনি।—কোথায় আড্ডা দিচ্ছিলি?

মুখ কচুমাচু করে যমুনা দাঁড়িয়ে। বললে, সোকানে কত ডিড়, আমাকে দিচ্ছিলই না, বত বলছি, শুধু বলছে, দাঁড়াও দাঁড়াও।

শুভা বললে, হ্যাঁ সবাইকে দিয়ে দেয়, শুধু তোকেই দাঁড় করিয়ে রাখে।

অর্থাৎ ওর কথাটা বিশ্বাস করেনি।

হিরণ্ময়ের খারাপ লাগছিল যমুনার অসহায় মুখটার দিকে তাকিয়ে।

মেয়েটার কথাবার্তা ইতিমধ্যে বদলে গেছে, গ্রাম্য টান আর তেমন নেই।

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা চেহারাটাই বদলে গেছে।

একটা রঙ চটে যাওয়া ছাপা আধময়লা শাড়ি পরে এসেছিল। মোরো ক্লিউজ আর সারা শুকোতে দিয়েছিল একদিন, ওসিকের বারান্দায়। বেবে পা খিনখিন করে উঠেছিল হিরণ্ময়ের।

বলেছিল, কাপড়চোপড় তো কিছুই আনেনি, ওকে শুম্রেনো শাড়িটাড়ি থাকে জো—

শুভা বলে উঠেছিল, সে তোমাকে ভাবতে হবে না। বিরুদ্ধি—একটু। একটু থেমে বলেছিল, আগে দেখি টেকে কি না।

তারপর একদিন হঠাৎ যমুনাকে দেখে চমকে উঠেছিল।

ক্রমির ফেলে দেওয়া কিংকা খিড়ে যাওয়া একটা ম্যাক্সি যমুনার পায়ে। মেয়েটা ফেন রাতারাতি বদলে গেছে। কে বলবে গ্রাম থেকে আসা একটা কাজের মেয়ে।

হিরণ্ময় ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিল।

হিরণ্ময়কে হাসতে দেখে শুভাও।

যমুনা সরে যেতেই শুভা হাসতে হাসতে বললে, ক্রমি কিছুতেই নিতে দিচ্ছিল না। বলছিল, ওটা দিয়ে তুমি বাসন কিনো।

—কেন?

শুভা বললে, ক্রমি হাসতে হাসতে বলছিল, ওটা পরলে ওকেই বাড়ির মেয়ে ভাববে, আমাকে না বি মনে করে!

হেসে গড়িয়ে পড়ছিল শুভা।

যমুনার ম্যাক্সি পরা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে সে-কথাগুলোই মনে পড়ল। সত্যি, ওকে সোকানে পাঠানোও এক ঝামেলা। ইচ্ছে করেই হয়তো ওরো বাক্য করিয়ে রাখে, ফস্টিনস্টার কথা কিছু বলে কি না কে জানে।

এই সবের জন্যেই এই বয়েসটাকে হিরণ্ময়ের ভয়। এই সব ভয়ের জন্যেই ও প্রথমে আপত্তি করেছিল। এই বয়েসের একটা মেয়েকে রাখা, এ কি কম দায়িত্বের কথা।

অথচ অকারণে মেয়েটা বকুনি খায়।

ওকে সোকানে পাঠিয়ে না একথাও বলতে পারে না। হঠাৎ হঠাৎ দরকার পড়লে না পাঠিয়েও তো উপায় নেই। কিছুকে দিয়ে তো কোন কাজই হবে না, ও বাড়িতে থাকে কতক্ষণ।

তা হলে তো হিরণ্ময়কেই যেতে হয়। কিন্তু ওরও আপিস থেকে কিরতে আটটা বেজে যায়। যাবে কখন।

দুঃখদিন যাকি-কি করে বেলাল হয়েই সিগারেট কিনে আনেন।
শোশাল বাড়তে গিয়ে পকেটে হাত নিয়েই বলে উঠেছে, এই বাঃ, সিগারেট
আনতে তুলে গেছি।

এর চেয়ে বিরক্তির কাজ আর নেই। বাসে কুলতে কুলতে, এসে এতখানি
হাঁটা, তারপর চরতলায় ওঠা, উঠে অবিরাম নেমে ছোট্ট গিয়ে সিগারেট কিনে
আনা, চরতলায়-আবার ওঠা....

ওর মুখে বোধহয় ক্লান্তি আর বিরক্তি ফুটে উঠেছিল।

যমুনা-হেসে-হাত পাশল; দিন না, আমি ছুটে গিয়ে এনে দিচ্ছি।
শুভার-বোধহয় আর হল হিরণ্যয়ের ওপর। লোকটা আপিসে খাটাখটুনি
করে এসেছে, বাসে কুলতে কুলতে, তারপর চরতলায় ওঠা।

কোন আশঙ্কি করল না, সজো হয়ে গেছে বলে।

যমুনা ছুটে চলে গেল, একটু পরেই এনে দিয়েছিল।

মেয়েটার এই এক গুণ। কাজে কোন বিরক্তি নেই। রাগ নেই। মুখের ওপর
কণ্ঠস্বর নেই। সব সময়ে হাসিমুখে কাজ করে। নেশার মধ্যে টিভি দেখা। তাও
চটপট-রাগা সেয়ে নেয় আগেই।

সে যদি কোকানে গিয়ে ঘেরি করে ফিরে থাকে, তার কথাটা অকিঞ্চিৎকর
কি-আছে।

মুখে এসে গিয়েছিল, সবু হিরণ্যয়ের বলতে বাধল। ও তো নিত্যদিন বাজারে
দ্যায়। সেথেকে, এই বয়েসের কাজের মেয়েদের কোন কোন ছোফরা সোকানী
কোন দৃষ্টিতে দেখে। কল বিশ পরমা ছেড়েও দেয়। বুজতে অসুবিধে হয় না
হিরণ্যয়ের। দু'একটা রসিকতাও করে। যে বয়েসের যা ধর্ম।

কিন্তু এসব শুভার না জানাই ভাল। জানলেই ওকে আর পাঠাবে না। তখন
হিরণ্যয়ের খাড়েই পড়বে। ও নিজেই তখন কাজের লোক হয়ে যাবে। কিংবা
সেই ভয়েই হয়তো শুভার ওকে সেরি করলেই বকুনি দেয়। দায়িত্ব তো ওরও।

যমুনা বকুনি খেয়ে মুখ কাঁচুমাঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় চোখে জল এসে
গিয়েছিল ওর।

—তুই বলতে পারিল না আমার কাজ আছে, তাড়াতাড়ি দাও। প্রায় ধমকের
সুরে কথা বলল।

মাথা নিচু করে রাসাঘরের দিকে চলে গেল যমুনা।

আবার হিরণ্য হাসতে হাসতে বললে, একটু আশঙ্কি আচ্ছা তো দেবেই। একটা
লোক সারাদিন মুখ বুজে কাজ করতে পারে। ওরও জে বন্ধু চাই, ওরও তো

কথা বলতে ইচ্ছে হয়।

ওভা কী কী চোখে তাকাল। চাপা গলায় বললে, সেটাই তো চাই না। ওদের
কথা বলা মানে তো কে কত বেশি মাইনে পায়, পুজোয় ভাল শাড়ি দেয়, কানের
বাড়ি কালার টিভি আছে....

একটু থেমে বললে, শুধু ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার ভাল। আর এরাও তো জেন্নমি
বোকা, সব বিশ্বাস করে বসে....

হিরণ্যয়ের প্রথমটা আশ্চর্য লেগেছিল।

ও কোথায় দায়িত্বের কথা ডাবছিল। একটা ধোল সতেরো বছরের মেয়েকে
বাড়িতে রাখার দায়দায়িত্বের কথা। আর শুভা কি না তাকে কারো সঙ্গে মিশতে
দিতে চায় না, পাছে কেউ ভাঙিয়ে নিয়ে যায়।

পরক্ষণেই মনে হল, কিছু ভুল করেনি। পাড়ার কাজের মেয়েগুলোকে তো
সেথেকে রাস্তার মোড়ে ঘেঁটি পাকায়। যেতে আসতে দু'চারটে কথাও কানে
আসে। কোন বাড়িতে ভের পাঁচটায় ঠেসে তুলে দেয়, কোন বাড়িতে টিভি
দেখার সময় হাত ফাই ফরমাশ।

হিরণ্যয়ের নিজেই অবাক লাগল। সত্যি বড়ো অকুত মন আমাদের। একটা
সরল জামা মেয়ে, দিবা হাসিমুখি, চটপট হাতে কাজ করে, বিরক্তি নেই, তার
জানো মেয়েটার ওপর সকলেই খুশি। মায়াও হয়। আহা, বেচারি কারো সঙ্গে
কথা বলতে পায় না, মিশতে পায় না।

শুভার কথাগুলো মনে পড়ল, জানো, ওদের অবস্থা নাকি ভালই ছিল, পরের
বাড়িতে খি-গিরি কখনও কেউ করেনি। বাবা রাজমিত্রির কাজ করত, তারা
থেকে পড়ে গিয়ে....

কিন্তু সব মায়ামমতা চাপা পড়ে যায় নিজেদের স্বার্থের কাছে। পাড়ার কোন
কাজের মেয়ে না ওর বন্ধু হয়ে যায়। তা হলেই ওকে চালাক চতুর বানিয়ে
দেবে। হয়তো নতুন জামাকাপড় চেয়ে বসবে, কিংবা মাইনে বাড়াতে বলবে।
কাজে ফাঁকি দিতে শিখবে। এও তো এক ধরনের বন্দীদশা।

হিরণ্যয়ের মনের ভেতরটা বলে উঠল, অন্যায অন্যায।

কিন্তু শুভার কথা শুনে নিজেদের স্বার্থ সন্থে সচেতন হয়ে উঠল। সায়
দিয়ে বললে, তা ঠিক, কারো সঙ্গে মিশতে না দেওয়াই ভাল।

আপিসে উমেশকে হাসতে হাসতে সে-কথাই বলেছিল। বেশ রসিকতা করে
বলছিল শুভার কত দুর্দৃষ্টি, সাবধানী, পাছে কাজের মেয়েটা ছিটকে কোথাও
চলে যায়....

সুধাকান্ত শুনছিল। শুনে চটে গেল।—আপনারা জ্যেষ্ঠীতিমত ক্রিমিনাল। এও তো এক ধরনের ক্রীতদাস। একটা ফ্যামিলি অভাব-অনটনের মধ্যে পড়েছে, তার সুযোগ নিয়ে তাকে ক্রীতদাস করে রাখতে চাইছেন।

উমেশ শব্দ করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, ভায়া কুমিও একদিন উন্নতি করবে, একটা কাজের লোক রাখতে চাইবে, আর তখন—

সুধাকান্ত রেগে গিয়েছিল। রাগের স্বরেই বলেছিল, নিজেরা চাকরিতে উন্নতির চেষ্টা তো করেন, অন্য কোম্পানিতে বেশি মাইনে পাওয়া যায় কি না খোঁজখবর করেন, আর ওরা দুটাকা বেশি পেয়ে যদি বাড়ি চেক করে—

সেইদিনই উমেশ স্বরটা এনেছিল।

এসে বসল, একটা সুখবর আছে।

হিরণ্ময়ের কাছে তখন আর কোন খবরই সুখবর নয়। ভেতরে ভেতরে ও তখন ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছে। যত ভাবে ততই উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ও তো চোখের সামনে পূর্ণচ্ছেদ দেখতে পাচ্ছে, একটা মোটা দাগের দাঁড়ি। পি এক আর থ্যাচুইটির টাকায় বাকি জীবনটা কি করে কাটিয়ে ভেবে থৈ পাচ্ছে না। তাই কোন কৌতূহলও বোধ করল না।

নীরস মুখে বললে, এখন আর আমার কাছে কোন খবরই সুখবর নয়, ওসব তোমাদের জন্যে।

উমেশ অতশত বুকল না। হিরণ্ময়ের মনের ভেতরে তখন কি চলছে বুঝবে কি করে।

ও টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বললে, সেই যে গতবছর আমরা ক'জন ওপরের গ্রেডের জন্যে আপীল করেছিলাম, ডিরেক্টর পাশ করে দিয়েছেন।

মাসে চারশো টাকা মাইনে বাড়ছে সেই স্বরে উমেশের মুখে উল্লাস।

ভেতরের চাপা বিরক্তি আর বুকের মথিখানের হতাশা যেন বলে উঠতে চাইল, স্টুপিড, স্টুপিড।

উমেশের এখনও পাঁচ ছ'বছর চাকরি বাকি আছে, সেজন্যেই ও এখনও স্বপ্ন দেখছে।

একদিন হিরণ্ময়ও দেখত। এ-সব স্বপ্নে একদিন ওরও মনের মধ্যে উল্লাস জাগত। এখন আর জাগে না। জেনে গেছে, পি একের সুদের হার ইনক্রিমেন্টের হারের কাছে শেষ পর্যন্ত হেরে যায়। ওর চোখের সামনে তো এখন একটা অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

তা হোক উমেশের আনন্দটা মাটি করে দিতে ইচ্ছে হল না হিরণ্ময়ের। আর দু'বছর পরেই যে ওর রিটারায়মেন্ট, সে-কথা উমেশও জানে। শুধু জানে না ভবিষ্যৎ ভেবে এখন থেকেই হিরণ্ময় বিচলিত হয়ে পড়েছে। ওর ভেতরের দুশ্চিন্তাটা আগিসের সকলের কাছ থেকে সফরে চেপে রেখেছে।

একদিন বেশ ফুর্তি ফুর্তি ভাব করে বলেছিল, আর তো দু'বছর, তারপর ভাই এই গোলামি থেকে মুক্তি পাবো। তোমরা মনটন দিয়ে কাজ করো, এসে সেবে যাবো মাঝে মাঝে, আর দিবা নিশ্চিন্তে দুপুরে ঘুমোবো। এককক্ষ টাকারি করে জীবনের শেষে ওটুকু সুখ যদি উপভোগ না করলাম তা হলে তো জীবনই বৃথা।

এমন ভাবে হাসতে হাসতে বলেছিল, যেন রিটারায়মেন্টে কত সুখ আর ও সেই দিনটার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

ভেতরের দুশ্চিন্তাটা কাউকে জানতে দেয়নি। জানালে আত্মসম্মান থাকে না।

উমেশ অতশত বোঝেনি। চারশো টাকা মাইনে বাড়বে এই শুভকর্মে বিশ্বাস করে ও তখন রীতিমত খুশি। বলে বসল, চলুন হিরণ্ময়দা, আজ একটু চাইনীজ যাবো, এত বড় একটা সুখবর।

উমেশ বুঝতেই পারেনি, হিরণ্ময়ের কাছে এখন আর এটা কোন সুখবর নয়। আরো দুটো বছর হয়তো আরো একটু সম্বলভাবে থাকা যাবে, কিংবা মিতব্যয়ী হয়ে সামান্য কয়েক হাজার টাকা বাঁচানো যাবে। কিন্তু কি লাভ, কতটুকু লাভ!

উমেশেরই বা কি মোষ। হিরণ্ময় নিজেও তো একসময় এই সব তুচ্ছ ছোট ছোট সুখকে অনেক বড় করে দেখেছে।

ও রাজি হয়ে গিয়েছিল।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই একটা মিনিবাস, মিনিবাসে বসতে পাওয়া। এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও বেশ খুশি খুশি মনে ফিরেছিল হিরণ্ময়।

দরজার সামনে এসে বেল বাজাল।

অন্যান্য দিন দু'মিনিটেও অপেক্ষা করতে হয় না। যমুনা কিংবা শুভা, কর্ণনো রুমি প্রায় ছুটে আসে। ওর বেল বাজানোর মধ্যে হয়তো কোন বিশেষত্ব আছে, শুনলেই বুঝতে পারে হিরণ্ময় এসেছে।

ছুটে এসে কেউ না কেউ দরজা খুলে দেয়।

কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও কেউই এল না।

আবার বেল বাজাল হিরণ্ময়।

এবারও একটু যেন সময় লাগল, তারপর খুঁট করে খিল বোলার দল।

হিরণ্ময়ই-বোধহয় কপাটটা চোলে ফুলল।

শুভা। মনুষ্যের জন্যে চোখোচোখি হল।

একটা ধমধমে মুখ। পলকের জন্যে চোখোচোখি হতেই মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে হিরণ্ময়ের চোখের আড়ালে চলে গেল শুভা।

হিরণ্ময়ের ইঁদাজ মনে হল শুভার এই মুখ ও কথনো দেখেনি।

অবাক নিঃশ্বাসে ও শুভার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে শোবার ঘরটিতে এসে চুকল। ঘরের মধ্যে তখন অদম্য কৌতূহল।

কি-ঘটে গেছে? কিছু কি ঘটেছে?

নিজেকে বিজ্ঞানী লগিল হিরণ্ময়ের। বাড়িওয়ালার ভব্রলোক কি কোন নতুন অশান্তি এনে দিয়েছেন? নাকি যমুনা মেয়েটা পার্বতীর মতই কিনা নোটিসে ছেড়ে চলে গেছে?

কিন্তু তা মনে হল না। শুভার ধমধমে মুখেও কেমন একটা বিজ্ঞানীর ছাপ ফেল দেখতে পেরেছে ও। বিজ্ঞানী না ভয়? নাকি চোখের আড়ালে ধমকে থাকা কোন চাপা কারা।

অনেককণ, অনেককণ অপেক্ষা করল হিরণ্ময়।

নিত্যদিনের মত যমুনা চা-খার বাবার নিয়ে এল না।

হিরণ্ময় মনে মনে কথাগুলো সাজিয়ে এসেছিল। শুধু চা দিস রে যমুনা, আজ আর কিছু ধাঁধো না।

তারপরই শুভার উদ্দেশে বলবে, উমেশ জোর করে ধরে নিয়ে গেল, আমাদের নাকি মাইনে বাড়বে, তাই...

এ-সব কিছুই বলতে পারল না হিরণ্ময়।

গোশাক বদলে কলঘর থেকে এসে চুপচাপ খাটের এক কোনায় বসে রইল ও। কেউ একজন আসবে এই আশায়।

শুভা, শুভাই হয়তো আসবে। এসে বলবে, কি ঘটে গেছে। কিংবা কিছু ঘটছে কি না।

কেউ আসছে না দেখে ক্রমিকে ডাকতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু মনে পড়ে গেল এ-সময় ও একটা টিউটোরিয়ালে পড়তে যায়।

আরো কিছুকণ পরে শুভা সেই ধমধমে মুখখানা নিয়ে এল। খাটের বাজুতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

অদম্য কৌতূহলের চোখে তাকাল হিরণ্ময়।

শুভার গলা থেকে একটা ভয়ঙ্কর স্বর কৈশে কৈশে গেরিয়ে এল। —কি

করবো আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

একটা চাপা কান্নার স্বর যেন তাতে মাখানো ছিল।

—কি হয়েছে কি? ভয়ের সম্পর্কে হিরণ্ময়ও যেন ভয় পেয়ে গেল, উৎকর্ষের স্বরে প্রশ্ন করল ও।

শুভা যেন দাঁড়াতে পারছে না।

কণ করে বসে পড়ল ও খাটের এক প্রান্তে।

হঠাৎ বলে উঠল, হি হি হি, আমাদের বাড়িতে যে এমন একটা শব্দ এসে চুকবে আমি ভাবতেই পারিনি।

হিরণ্ময় যেন আরো ঘাবড়ে গেল। বললে, কি হয়েছে? বলো শব্দটুকু করে।

শুভা গলার স্বর নামাল। চাপা গলায় ফিসফিস করে বললে, যমুনা। যমুনা একটা কলেজারি করে বসে আছে।

হিরণ্ময় তখনও বুঝতে পারছে না। ঐ সরল গ্রামা মেয়েটার নিষ্কণ্ণ মুখ তখনও ওর চোখের সামনে ভাসছে।

জিগ্যেস করল, কি করেছে ও?

অবাক চোখ-মেলে শুভা হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকাল। এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছে না হিরণ্ময়।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কিছু কিংবা ক্রমি আছে কি না।

তারপর ফিসফিস করে বললে, বলছি তো, যমুনা, ভাল ভাল বলতাম, খুব সরল মনে করতাম, লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা কলেজারি বাণিয়ে বসে আছে। শুভার চোখের কোনায় যেন এক বিস্ময়-ছল।

উদ্ভ্রান্তের মত বলল, ওকে নিয়ে কি-করবো আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

হিরণ্ময় তখন একটা ধসে পড়া মানুষ।

কপালে দৃষ্টিভঙ্গির রেখা কুটে উঠেছে, বুকের মধ্যে ভয়। চতুর্দিক থেকে যেন অনেকগুলো অর্পবাসের নখ ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

একটা ছ্যাডাল। ওরই বাড়িতে।

শুভা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, মেয়েটা শুধু কাদছে, কিছুতেই বলছে না, কে ওর এই সর্বনাশ করল।

শুভার গলার স্বরেও কান্না। বলে উঠল, ওকে নিয়ে আমি কি করি বলো তেজ

একটুকণ শুধু হয়ে রইল হিরণ্ময়। তারপর কঠিন কর্কশ গলায় বললে, তাকিয়ে দাও, এখনই তাকিয়ে দাও।

॥ তিন ॥

আপিসে কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারছিল না হিরণ্ময় । ও সন্ন্যাসকল কেমন কেন অনমনস্ক হয়ে আছে । আপিসে আসার সময়ে একটা স্টপ পার হয়ে চলে গিয়েছিল ।

উমেশ একবার এসে কি সব বলে গেল, ওর কানেও গেল না ।

ভয়ানক ঘুচে গেল হাতের স্পর্শে । —শরীর ধারণ নাকি হিরণ্ময়না ? ই না কিছুই যে বলছেন না !

সুধাকান্ত এসে হঠাৎ বললে, কি ভাবছেন এত ?

সুকুমার-ওর পাশের টেবিলেই বসে, বারকয়েক আড়চোখে লক্ষ করেছে ।

সটান উঠে এসে বলল, আপনাকে ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছে হিরণ্ময়বাবু ।

আপনি বরং বাড়ি চলে যান ।

হিরণ্ময় তার দিকে মুখ তুলে ডাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল, অসুস্থ ? কই না তো !

আসলে ভেতরের আতঙ্কটা ও কিছুতেই চাপা দিতে পারছে না ।

একবার ভেবেছিল উমেশকে বলবে ।

পরক্ষণেই শুভার সাবধানবাণী মনে পড়ে গিয়েছিল । —দেখো, কাউকে যেন কিছু বলে বসো না । ও যতক্ষণ না বিদেয় হচ্ছে...

এখন আর যমুনা মেয়েটার জন্যে একটুও মায়ামমতা নেই ।

এখন শুধু দুশ্চিন্তা । রিটার্নারমেন্টের দুর্ভাবনা এখন তুচ্ছ হয়ে গেছে এই বিপদের কাছে । এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেলেই যেন শান্তি, সুখ ।

ভাবতে ভাবতে একসময়ে ও ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রেগে উঠছিল শুভার ওপর । শুভা কেন নির্মম হয়ে উঠতে পারছে না, নির্দয় হতে পারছে না ।

ওর কাছে যমুনা এখন একটা আতঙ্ক ।

এই মেয়েটাকে নাকি ও একদিন সরল আর নিষ্পাপ ভেবেছিল । সেই ছবিটা এখনও ওর মনের মধ্যে গাঁথা আছে ।

সিমেণ্টের মেঝেতে খড়ি দিয়ে একটা ছক কেটেছে । দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটা খুঁটি নিয়ে একা একাই বায়বানী না কি যেন খেলছে ।

হিরণ্ময়কে দেখে অবাক চোখে তাকাল । কি সরল গ্রাম্য নিষ্পাপ মুখ । হঠাৎ কি মনে হতে বঁট করে উঠে দাঁড়াল, লজ্জায় আর ভয়ে মুখ নিচু করে পাড়িয়ে রইল, পিছনে হাত লুকিয়ে হাতের খুঁটিটা লুকোতে চাইল । যেন কত বড় অন্যায় করে ফেলেছে ।

সেদিন ওকে দেখে মায়া হয়েছিল । পলিমাটির মত গানের রস, পলিমাটির মতই মোলায়েম, বড় বড় নিবোধি চোখে কুঠা আর ভয় ।

এখন ভয় হিরণ্ময়ের বুকের মধ্যে । যেন হঠাৎ খুন করে ফেলা একটা মানুষের শব্দেই ওকে গোপনে লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে ।

শুভা বলেছিল, তোমার তো সব্ব্বতেই আপত্তি, সব্ব্বতেই ভয় । এই বয়েসের কাজের মেয়ে যেন কেউ আর রাখছে না ।

ভেতরের চাপা রাগ থেকে ওর বলে উঠতে হচ্ছে হজ্জিল, কি, হলো তো ! কিছু বলতে পারিনি । এখন আর শুভার ওপর রেগে যেতেও পারছে না ।

এখন শুধু মনের মধ্যে একটাই চিন্তা, কি করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, পরিত্রাণ পাওয়া যায় ।

—তাড়িয়ে দাও ওকে । একুনি তাড়িয়ে দাও । কঠিন কর্কশ গলায় বলেছিল ।

তাড়ানো যে খুব সহজ হবে না সে আশঙ্কা বোধহয় ছিল । তাই পরের দিন সকালে আপিসে বেরোনোর সময় বলেছিল, ওর যা মাইনেপত্র হিসেব মিটিয়ে আরো একশো টাকা বরং দিয়ে দিয়ো ।

আরো একশো টাকা । ওটা ঘুস না বিবেকের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে, হিরণ্ময় ঠিক জানে না । অথচ দু'দিন আগে ও দশটা টাকাও বেশি দিতে রাজি হ'ত না ।

সিদ্ধ সরল সেই মেয়েটার চেহারা রাতারাতি যেন বদলে গেছে হিরণ্ময়ের দৃষ্টিতে, ও এখন একটা ভয়ঙ্কর মানুষ ।

—কি বিপদ হলো তো, কিছুতেই বলছে না কে ওর এই সর্বনাশ করল । শুভার ক্রান্ত আর হতাশার কঠর যেন কানে বাজছে ।

আর সেজনেই যেন ভয়টা আরো বেশি । ঐ মেয়েটার সামান্য একটা কথা তো যে কোন বিপর্যয় ঘটাবে দিতে পারে । হিরণ্ময় কিংবা কিস্টুর ।

মুহুর্তের জন্যে একটা সন্বেহ দেখা দিল, পরক্ষণেই মন বলে উঠল, অসম্ভব

অসহ্য। কিন্তু শুভা কি-নিমেষের জন্যেও হিরণ্যকে সন্বেদ করতে পারে।
শুভা কিংবা হিরণ্য কি ভাবছে সেটা বড় কথা নয়। এই গোশম ধবড়াই
কোনরকমে জন্মরাশি নিয়ে গেলে আশপাশের ছাত্রের ভাড়াটেরা কি ভেবে বসবে
কে জানে। কিংবা বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে বাণী। উনি তো সুবোধ পাতন। তার
পাড়া-প্রতিবেশী হুততো জায়েবরায়ে বটনা করে বসবে।

বাড়ি ফেরার সময় হিরণ্য আশা করছিল, ফিরে এসে দেখবে শুভা দুপুরেই
এককোটা টাকা বেশি নিয়ে ওকে বিদায় করে দিয়েছে। তা হ'লেই মুক্তি।
তা হ'লেই একটা দুঃখের থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবে ও।

একটা দুপুর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওর বাবা আর মা নবজীব ওপরে
বাড়িয়ে আছে। যমুনার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে।

বাবা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক প্য এগিয়ে এল। মুখে হাসি।
বাবা বলছে, মেয়ে আমার কি বলতেছে শোনেন বাবু। বলতেছে মেয়ের
মকন ভলবাসেন আপনেকা, কুখাও এ বাড়ি ছেড়ে যাবেনি ও।

জগৎ হাসছে। বলছে, আপনেকের হাতে বিল্যম বাবু, মারেন করেন যা করেন,
ও আপনেকের মেয়ে। আমার মেয়ে বড়ো ভাল বাবু।

শুভা বলছে, হ্যাঁ সত্যি তো, ও আমার মেয়ের মতই। তোমরা কিছু ভেবো
না।

কথাগুলো এখন যেন নিজের কানেই ঠাটার মত শোনায়।

—তাড়িয়ে মাও, ওকে একুনি তাড়িয়ে লও। হিরণ্য বলছিল। জেন এ
বাড়ি থেকে চলে গেলেই ওরা নিশ্চিত হতে পারে। এখন আর মাঝা-মুঠার
একটুকু যেন অবশিষ্ট নেই। নেই কি? তা হ'লে বাবুরা যমুনার মুখটা মনে
পড়ছে কেন? ভাবা থেকে পড়ে গিয়ে খোঁকা হয়ে যাওয়া যমুনার, যমুনার
বাবার, অসহ্য মুখটা বাবুরা চোখের সামনে ভেসে উঠছে কেন?

যমুনার বাবা সেই প্রথম দেখা করতে এসেছিল। বাবাকে মাকে দেখে যমুনার
চোখ হলদল। শুভা তো ঐতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এখানে মন টিকছে না
নাকি যমুনার? বেশি ফিরে যেতে চাইছে না ওর। একটা রানও হয়েছিল। ওর
আঁকর মত, জামাকাপড় দিয়েছে, কাছ তুল করলে হাসিমুখে আঁকর খুকিয়ে
দিয়েছে। একটা দিনও বকাবকা করেনি, তার এই প্রতিশ্রুতি।

পাছে ওর বাবা-মা তুল বেয়ে জাই শুভা হেসে হেসে বলছে, ও ঠিক তে
যমুনা, স্বাধো স্বাধো মুখ কেন, আমি কি তোকে মারি না বুকি।

ওর মা বলে উঠেছে, না না মা, বকাবকার কথা তো ও বলছেনি। বলটার

চপড় বহু বড় সন্ন্যাসী, তাই কান্ডিতছে। দেশী ছেড়ে এই শেষম ভলকোতার
হুতর ঘরে এলো—

হিরণ্য বলেছে, শরের খর বলছো কেন, ও তো আমার বাড়িরই হয়ে
গেছে। মেয়ের মত।

মা সাধুনা দিয়েছে, ধলও তো এই কাম্পানেই রয়েছে, আসবেনি
মাকেমাকে।

শুভার নিকে তাকিয়ে বলেছে, আমার বড় বোঁও কসবাড়, বরম ভতে মা,
ছুটি পেসে আসবে।

সন্ধান দিয়ে মাঝার হাত বুলিয়ে চলে গিয়েছিল।
বাবা টিক ওর উপর। এসেছে মাকেমাকে। বেদন ঢালাকচুর, তেহনি
কনকনে। কালোকুলো দেখতে, শুশু নাকটার টিকলো।

এখন তাকেও ভয়।
তাড়িয়ে লও তাড়িয়ে লও বলছে বটে হিরণ্য, কিন্তু মনের মধ্যে একটা
দুশ্চিন্তাও রয়েছে। ওর বাবা-মা এসে হাজির হলে তখন কি বলবে। কিংবা ওর
কনকনে মিলিটা, বলা, যদি এসে বলে, আমার বুটী তই। টাকাকড়ি নিয়ে চলে
গেলেও কি যমুনা মিনির কাছে যাবে। কিংবা বেশি বলা-মার কাছে।

জাপিস, হুত মিলল হিরণ্য, মনের ভেতর একটা প্রবল উত্তর দেবে
তোষে। উমেশ কিংবা সুধাকার কাউকেই বলতে পারেনি। কি জানি ওরা কি
ভেবে বসবে। কম বয়েসে কম তুল হাওয়া ছিল হিরণ্যের। কিন্তু এই ছায়ায়
বন্ধর বহুসে পৌঁছে দেখছে, চলেই পাও হয়েছে, শরীর থেকে বৈদন চলে
যাবনি। সব কনকনে, উমেশ হুতরো ওকেই সন্বেদ করে বসবে। তার চেয়েও
সাজবাজির কথা, হিরণ্যের ভলভেও ভয়, হুততো নিটুকে সন্বেদ করবে।
এখন সময় জামসন্ধান কুলয়ে যমুনা মেয়েটার একটা কথার ওপর। ও কি
বলে বসবে কে জানে।

ও তো ভিত্তিতেই বলছে না, কাজে নাম করছে না, কি ছালা দেখ নিকি। শুভা
হাড কপার হুতর হয়েছিল।

আউলেকটা কে কিছুকেই বুঝে কেব করতে পারছে না ওর, কনকনও করতে
পারছে না কে হতে পারে।

জাপিসে সারাজন ওতে জন্মনবর দেখে, কথার উত্তর না পেয়ে উমেশ
বলেছিল, শরীর ধায়া নাকি হিরণ্যেরা।

সুধাকার এসে হঠাৎ বলেছে, কি ভাবছেন ওর।

পাশের টেকিল থেকে উঠে এসে সুকুমার বলেছে, আপনাকে জীবন অসুখ দেখাচ্ছে হিরণ্ময়, আপনি বরং বাড়ি চলে যান।

যত তখনেই ততই ভয় পেয়ে গেছে হিরণ্ময়। এরা না সন্দেহ করে যেন বাড়িতে কিছু একটা ঘটেছে। কি ভয়ঙ্কর ঘটনা। যেন হঠাৎ খুন করে কেলে একটা মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছে বাড়ির মধ্যে। কিছুতেই সেটা সরিয়ে ফেলতে পারছে না।

একটা ক্ষীণ আশা মনের মধ্যে ছিল। হয়তো শুভা বুঝিয়ে সুজিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে শেষ অবধি যমুনাকে বিদেয় করতে পেরেছে।

দরজার বেলটা টিপতেও ভয়-ভয় করছিল।

বেল টিপতেই আধ-মিনিটের মধ্যে শুভা এসে দরজা খুলে দিল। যেন ও এতক্ষণ অপেক্ষাই করছিল।

হিরণ্ময় ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, গেছে ?

শুভার মুখে তখনও দৃষ্টিভ্রম ছাপ। মাথা নেড়ে শুধু ইঙ্গিতে জানাল, না। সেই ক্ষীণ আশাটুকুও উবে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

শোশাক বদলানোর কথাই ভুলে গেল হিরণ্ময়। চূপচাপ নিঃশব্দে নিজের ঘরটিতে এসে বসল।

শুভাও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল।

ফিসফিস করে হিরণ্ময় প্রশ্ন করল, ও কোথায় ?

চাপা গলাতেই উত্তর দিল শুভা, ঐ তো ওখানে, রান্নাঘরের সামনে। সারাদিন শুধু কাঁদছে, দেখে এত মায়া হয়...

মায়া। সাদা শরীর যেন চিড়বিড়িয়ে উঠল হিরণ্ময়ের। কিন্তু একবার যেন যমুনাকে দেখতেও ইচ্ছে হ'ল। আহা, অসহায় একটা মেয়ে। সরল গ্রাম্য। তার কি দোষ। এই ক্রোধান্ত শহরটাকে চিনবে কি করে।

পরক্ষণেই মনে হ'ল দোষ তো যমুনারই। শুভা তো কত সাবধানী ছিল, সোকানে গিয়ে একটু সেরি করলেই বকুনি দিত। কারো সঙ্গে কথা বলতে, মিশতে বারণ করত। সে কি শুধু স্বার্থের জন্যে। হিরণ্ময় চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, কিন্তু ক্রমি ওরা কিছু জানে না তো ?

—না।

এই এক মুশকিল। শুভার সঙ্গে যে আলোচনা করবে, তাও ফিসফিসিয়ে। যমুনা না তখনতে পায়, কিন্তু ক্রমি কিছু না জানতে পারে।

হিরণ্ময় ভাবল, ও নিজেই গিয়ে যমুনাকে চলে যেতে বলবে। যেখানে পুলিশ ও

জিলাস ব্যাক, যা পুলিশ করুক। আমার কি দায়। অন্যায় করেছে, তার ফল ভোগ করুক না ও। ওর কাছা সেবে সেবে শুভার তো মায়া হচ্ছে, হয়তো বলতে পারছে না। মেয়েদের জন্যে মেয়েদের বড়ো বেশি মমতা, কাণ্ডাকাণ্ড জানা থাকে না ওদের। নির্মম হতে পারে না।

কিন্তু হিরণ্ময়ই কি পারবে ? একবার উঠে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াতে ভেবেছিল। কিন্তু সাহস হ'ল না। মেয়েটা হাউহাউ করে কেঁপে উঠে যদি ওর পা জড়িয়ে ধরে ! তখন কি করবে।

শুভা ধীরে ধীরে বললে, ওকে আজ ওর দিদির কাছে পাঠিয়েছিলাম।

চমকে উঠল হিরণ্ময়। ক্ষণিকের জন্যে রেগে গেল। হতাশার গলায় বললে, দিদির কাছে ? কেন ?

শুভা চাপা গলায় বললে, তাকে গিয়ে বলুক, যা করার সে করবে।

—তুমি কি বোকা। হিরণ্ময় বললে, সে তো আমাদের একন প্যাঁচে ফেলতে পারে। হয়তো বলবে, আমাদের বাড়িতে দিয়ে গেছে, আমাদেরই দাব্বি।

হিরণ্ময়ের মনের ভেতরেও সেই কথাটাই শুমরে উঠছিল। আমাদেরই দাব্বি, আমাদেরই দাব্বি। ওর বাবা-মা তো আমাদের ভরসাতেই দিয়ে গেছে।

হিরণ্ময় বিরক্তির স্বরে বললে, তুমি শেষে ওকে ওর দিদির কাছে পাঠালে ?

একটু ঘেমে বললে, কি বলেছে ওর দিদি ?

শুভা চূপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে, দেখা হয়নি।

একটু ঘেমে বললে, তোমার জন্যেই তো হ'ল।

হিরণ্ময় একটা জোর ধাক্কা খেল। —আমার জন্যে ? কি বলছে তুমি ?

ভেতরে ভেতরে গচও রেগে গেল হিরণ্ময়। কি বলবে কিছু ভেবে পেল না।

রাগটা বুঝতে পারল শুভা। সঙ্গে সঙ্গে সেও রেগে গেল। —হ্যাঁ, তোমার জন্যেই। তুমি তো প্রায়ই সিগারেট কিনে আনতে ভুলে যেতে। সন্দের পর আমি ওকে বাইরে যেতে দিতাম না। তুমিই তো পাঠাতে ওকে।

ঘাম দিয়ে স্বর ছেড়ে গেল হিরণ্ময়ের। থাক, ও যা ভেবেছিল তা নয়। শুভা যদি শুকেই সন্দেহ করে বসত তা হ'লে আর লাঞ্ছায় মুখ দেখাতে পারত না। না, এ রকম একটা নোংরা সন্দেহ শুভা করতে পারে না। করলে এতদিনের সম্পর্কটা ভেঙে খানখান হয়ে যেত, তখন আর জোড়া লাগত না।

কিন্তু সত্যি নিচু হয়ে গেল হিরণ্ময়ের।

অভিহী তো। ভেঁহব দেখেনি।

তখন নিজের ক্রান্তিটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এতখানি হেঁটে এসে

শুভরতলায় উঠে কার আর ইচ্ছে হয় আবার নেমে গিয়ে বড় রাস্তার মোড় অবধি
হাঁটা। কাছে-পিঠে একটা পান-সিগারেটের সোকানও নেই।

তাই মাঝে মাঝে বলেছে, যা তো যমুনা, সিগারেট আনতে ভুলে গেছি।
যমুনার সব সময় হাসিমুখ। হাত পেতে টাকা নিয়েছে, নিয়েই ছুট।
হিরণ্ময় কিছু ফাইফরমশ করলে যমুনা যেন ভীষণ খুশি হ'ত। কিবো
হিরণ্ময়কে খুশি করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করত।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ল, যখনই ওর রাস্তার প্রশংসা করেছে, যমুনার সারা মুখে
যেন কৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে।

এখন মনে হচ্ছে ওর সোবেই মেরেটার আজ এই অবস্থা।

—লোকটা কে তা বলেছে? হিরণ্ময় প্রশ্ন করল।

শুভা চাপা গলায় বললে, ঐ সব সোকান-বাজারের লোকটোক হবে হয়তো,
কিন্তু তো বলেছে না। শুধু কীদছে।

কার দোষ? কার আবার। একটা রাজমিস্ত্রি, সুখে-স্বচ্ছন্দে সন্সার চালায়।
সে ডারা থেকে পড়ে গিয়ে খোঁড়া আর অকর্মণ্য হয়ে যায়। তখন তার এই
বয়েসের মেয়েকে পরের বাড়িতে কি-গিরি করতে যেতে হয় কেন? আমরা
একটা কাজের মেয়ের জন্যে হনো হয়ে উঠি কেন? একটা গ্রাম্য সরল মেয়েকে
এই পঙ্কিল শহরের মধ্যে তার বাবা কেন ছেড়ে দেয়? কেন তাকে বড় রাস্তার
মোড় থেকে সজোরে পর সিগারেট কিনে আনতে পাঠাই?

হিরণ্ময় সোবখালনের চেষ্টায় বললে, তুমিও তো ওকে বাজারে পাঠাতে।
শুভা রেগে গিয়ে বললে, সে তো দিনের বেলায়। দেরি করলেই বকুনি
দিতাম। তখন তোমার কত দরদ, সোকানীরা নাকি সত্যিই কাজের লোকদের
লুট করিয়ে রেখে বাবু-বিবিদের আগে দেয়।

হিরণ্ময় চুপ করে গেল। কি আর বলবে। এদের ধারণা যা কিছু পাপ, যা
কিছু অনাচার সবই শুধু রাতের অন্ধকারে ঘটে।

কার দোষ? হঠাৎ একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল হিরণ্ময়ের। চোখের
সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। মনে মনে বললে, দোষ তো ওর ঐ শরীরটার।
ওর ঐ বয়েসটার। আর কারো নয়।

শুভা ততক্ষণে শান্ত হয়েছে। বললে, ও তো রাস্তাঘাট চেনে না, পাড়ার
একটা কাজের মেয়ে ওর বন্ধু, তাকে নিয়ে দিদির কাছে গিয়েছিল।

—সর্বনাশ। অবাক হয়ে তাকাল হিরণ্ময়। জিগ্যেস করল, তাকে সব বলেছে
নাকি?

শুভা উত্তর দিল, কি করে জানবো। গিয়েছিল, দিদি নাকি দেশে গেছে, কবে
ফিরবে ঠিক নেই।

কথাগুলো কানে গেল, অন্যান্যভাবে বললে, দেশে গেছে? দেশে গেল
অবশ্য যমুনার সঙ্গে দেখা করে গেল না?

বলল বটে, কিন্তু হিরণ্ময়ের মাথায় তখন অন্য চিন্তা। পাড়ার একটা কুঞ্জের
মেয়ে ওর বন্ধু, তাকে নিয়ে দিদির কাছে গিয়েছিল যমুনা। কিন্তু তাঁর কাছে সব
কথা বলে ফেলেনি তো? একজনকে বললেই তো সকলে জানবে, তাদের কাছ
থেকে পাড়ার সব বাড়ির গিন্নিরা। কাজের মেয়েদের কাছ থেকেই তো এ বাড়ি
ও বাড়ির খবর জোগাড় করে ওরা।

হিরণ্ময়ের মনে হল কাজটা ভাল করিনি শুভা। ওকে কি দিদির কাছে
যাওয়ার পরামর্শ শুভাই দিয়েছে?

ওর দিদি গঙ্গাকে দু' চারবার দেখেছে হিরণ্ময়, দু'বার বোম্বয় বাবা-মা
আসতে পারবে না বলে গঙ্গাই ওর মাইনেটা নিয়ে গেছে।

পাওনাগুণা বুকে নিতে খুব ওস্তাদ। শেষবার টাকটা নিতে নিতে বলেছিল, এ
মাইনেতে আজকাল আর কেউ কাজ করে না।

অর্থাৎ মাইনে বাড়িও।

শুভা কোন উত্তর দেয়নি।

দিদিটা বলেছে, এ মাস থেকে দশটা টাকা বাড়িয়ে দেবেন।

শুভা বিরক্তির স্বরে বলেছে, সে তোমার বাবার সঙ্গে কথা হবে, তুমি টাকা
নিতে এসেছো নিয়ে যাও।

সেই ঝনঝনে বৃষ্টির মেঘটার কাছে কিনা যমুনাকে পাঠিয়েছিল শুভা।
গঙ্গাকে কোন বিশ্বাস আছে নাকি। ও ভেে সুযোগ বুঝে ওদের আমেলায়
ফেলতে পারে। মনে মনে ভাবল, ভাগ্যিস দেখা হয়নি।

—ওকে দিদির কাছে পাঠিয়ে কাজটা ভাল করনি। হিরণ্ময় বলল।

শুভা ওর মুখের দিকে তাকাল। বললে, আমি কি পাঠিয়েছি নাকি? ও
নিজেই যেতে চাইল।

একটু থেমে বললে, ও কি চুপচাপ বসে বসে কীদবে! ওকেও তো কিছু
একটা করতে হবে।

কিন্তু একটা করতে হবে, কিছু একটা করতে হবে। কি করবে হিরণ্ময়
কিন্তুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু তাড়িয়ে দিতে পারলেই ফেন নিস্তার
পেয়ে যেত।

অমরেন্দ্রের কি যোগ। তুমি অন্যায় করেছিল, শাস্তি তোকেই পেতে হবে।
পাপ করেছে, অন্যায় করেছে। হিংস্রদের হঠাৎ মনে হল পাপপুণ্যের বিচার
করার আশি কৈ। পাপপুণ্যের বিচার কি এত সহজে হয় ?
এই বয়েসে একদিন হিংস্রদের নিষ্কলংক ছিল। সেদিন নিষ্কলংক পতীতকে
নিষ্কলংক ভিত্তি না। সঙ্গে সঙ্গে দেখা হল কিশোরীও তো সেই বয়েসে। আঠারো
পেরিয়েছে।

না, অমরেন্দ্রের সঙ্গে কিশুরী কথাব্যবহাৎ বিশেষ বলত না। যমুনাও কাছ ঘেঁসতে
চাইত না। কেমন লজ্জা লজ্জা ভাব করত যেতে দেবার সময়।
সরাসরি গ্রন্থও করত না, শুভাঙ্কেই দরজা থেকে গ্রন্থ করত, দাশা কিছু মেয়ে
মা ?

শুভা চূপচাপ বসে ছিল বাটের এক কোণে।
হঠাৎ বললে, কি একটুয়ে মেয়ে বাবা, কিছুতেই বলছে না কে।
আবার একটু চূপচাপ।

—অনেক করে জিগ্যাস করতে ইঁপিয়ে কৈশে উঠল আজ। শেষে বললে,
এই বাড়িরই লোক। শুনে তো আমার হাত-পা জঁপছিল।

হিংস্রদেরও হাত-পা কৈশে উঠল। —কি বলছে ?
একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল : —কে যে হাতে পারে আমি তো কিছু বুঝতেই
পারছি না।

হিংস্রের কোন কথা বলল না, ওর পতীর তখন খরখর করে জঁপছে।
এই বাড়িরই লোক ? কি বলতে চায় যমুনা ? নাকি সব মিথ্যা কথা, ভিলিটার
সঙ্গে দেখা হয়েছে সেই এ-সব বলতে শিখিয়ে দিয়েছে।

হিংস্রেরও সন্দেহও কি কোন সন্দেহ দেখা দিয়েছে শুভাঙ্ক মনে ? কথাব্যবহাৎ
তো কই বোঝা গেল না।

তা হলে কি
হিংস্র হঠাৎ বললে, কিশুরী কোথায় ?
—ও তো শড়ছে।

হিংস্রের কি মনে হচ্ছিল হঠাৎ সেমিকেই পা বাড়াতো বাচ্ছিল।
শুভা মুত এগিয়ে এসে ওর হাতখানা ধরল। বললে, তোমার কি মাথা-জোখা
হাওয়া চলে গেল ? হি হি হি, তুমি কিশুরী কথা ভাববে শরৎসে।

শুভা ওর চোখে চোখ রেখে তাকাল। বলল, আমি জিগ্যাস করছি
যমুনাকে। আমাকেও বাড়ির কথা বলছে না ও, এই বাড়ির কথা বলছে।

হিংস্রের নিশ্চিন্ত হল। বললে, কিশুরী কথা আমি জানিনি।

তবু তার খবর দিকিই এগিয়ে গেল।

এ খবর একটা ডাইনিং টেবল। সেটাই ওদের পড়ার টেবিল। দেখল, এক
প্রান্তে কিশুরী বই খুলে পড়ছে। অন্য প্রান্তে চমি বাতায় কসকল করে লিখে
চলেছে, হয়তো নোট তুলছে।

হিংস্রের গিয়ে একটা চোয়ার টেবল নিয়ে বসল। বললে, শড়খোরা ঝিক ঝিক
করছিল তো। তোর ভো পতীত এসে গেল।

মুখ তুলে কিশুরী হাসল। ঘাড় নাড়ল।

কিশুরী মুখের দিকে তাক করে তাকিয়ে দেখল হিংস্রের। না, এ মুখে কোন
অন্যায় লুকিয়ে নেই।

যমুনাকে সন্দেহও কি কোনদিন মনে হয়েছিল।

পতীর বড়ো অবিদ্যাসী। এসেই এই বয়েসটোও।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। একটা দৃশ্য।

অনিমেদের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

অনিমেদ ওর কলসের বন্ধু। কলসের থেকে বেড়িয়ে এসেও যেসকল জীবনে
ওদের আচ্ছাদন ছেদ পড়েনি। একে একে সকলেই মূরে মূরে গেল। অনিমেদই
তার হিংস্রের দু'জনেই চাকরি গেল। কিছু দু'জন খুঁজতে। অসম্পর্ক ওদের
নিরমিত দেখা হ'ত, জড়িত হ'ত। সব মনে হ'ত এই সেদিন।

কি করে যে বছরগুলো হুত পার হয়ে গেছে কে জানে।

অনিমেদ দু'মুঠো মেয়ে আর একটা ছেলেকে নিয়ে তখন কোঁর সন্দেহী।
আল-হাওয়া আগের মত আর ছিল না, তবু বিশেষ-আলসে পতীতের পরশিত্তি
কালে ছুটী আসত। কোমল হ'ল পড়তেই মনে হ'ত গী। দিন মাস কি হুঁ মাস
পরে দেখা হলেও মনে হ'ত এই যেন গতকাল চাইলে দেখানো হ'ল পতীতের
করে গেছে।

বুঝ গাড় বন্ধুত ছিল দু'জনের।

অনিমেদের কড় মেয়ে জীবন তখন এই তরমুসি বয়েসে। যেন কি সন্তোষে।
পতীর সঙ্গে পাশাপাশি খুলেছে, পতীর নিষ্পাপ বেতনায়ের মত মনে হ'ত জীবন।
অনিমেদের ছোট ছেলেটি তখন আট কি দশ। যে দেখত সেই ভালবাসে
কেনত।

জীবনও তাকে খুঁই ভালবাসত।

হিংস্রের একদিন হঠাৎ নিচ্ছে। জীবন তাকে দেখেই এক মুখ টেনে চিবকর

করে জলকল, ভাইয়া, ভাইয়া, সেখা বা কে এসেছে।

মীনা বন্ধন 'ভাইয়া' বলে ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করত সেখা চোখ জুড়িয়ে নেত।

কি সুখী সংসার ছিল অনিমেবের। তার জীবনে যে এমন একটা অন্ধকার ঘনিরে আসবে হিরণ্ময় কোনদিন তাবেনি।

হঠাৎ একদিন আপিসে একটা ফোন এল। অনিমেবের ফোন। —হিরণ, এক্ষুনি একবার আসতে পারবি আমার বাড়িতে? ছেলোটোর ভীষণ অসুখ, কি করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

হিরণ্ময় চলে গিয়েছিল।

সেখা অসহ্য লেগেছিল। কি একটা দুর্বোধ্য রোগ। ছেলোটো খুল থেকে বাড়ি ফিরেই বলেছে, মাথার ব্যথা। দেখতে দেখতে ওর সারা শরীর নাকি নীল হয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার এসেছেন সঙ্গে সঙ্গে। কিছু কিছুই বুঝতে পারেননি তিনি।

বলেছেন, হাসপাতালে নিয়ে যান।

কে কেন হিরণ্ময়কে সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। প্রচণ্ড হাড় কাঁপানো শীত সেদিন।

অনিমেব আর অনিমেবের স্ত্রী হাসপাতালের সিঁড়িতে বসে আছে। রক্তীর ঘরে যেতে পারনি। অপেক্ষা করে আছে, ডাক্তারের কাছে থেকে এতটুকু ভরসা যদি পায়।

অনেক রক্ত অবধি বসে থেকে কিছু মিথ্যা ঝোঁকবাক্য দিয়ে চলে এসেছিল হিরণ্ময়। মিথ্যেই তো।

আসার সময় অনিমেবের প্রতিবেশী ভদ্রলোক যিনি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর হাতে পক্ষের ব্যড়ির টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে এসেছিল।

ভদ্রলোকই চেয়েছিলেন।

কিরে এসে ও সব খেতে বসেছে, শুভার কাছে বলছে, অনিমেবের ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, রোগ ধরতে পারছে না কেউ...

ঠিক সেই সময় পাশের বাড়ি থেকে কে ফেন হিরণ্ময়ের নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। আমলাদার গিয়ে দৌড়তেই বললে, আপনার ফোন, আপনার ফোন। বলছেন, খুব অসুখী।

হিরণ্ময়ের শরীরটা বোধহয় সেদিন ভাল ছিল না, সকাল থেকেই কেমন জ্বর-জ্বর। ওর ওপর হাসপাতালের বাইরে হাড় কাঁপানো শীতে বসে দুই কি

ভারও বেশি থাকতে হয়েছে।

তবু একটা চাদর গায়ে দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে গেল।

অনিমেবের প্রতিবেশী সেই ভদ্রলোক। বললেন, শিগগির আসুন একবার, আসুন। অনিমেববাবুকে, তাঁর স্ত্রীকে সামলানো যাচ্ছে না। শিগগির একবার আসুন।

হিরণ্ময় উৎকণ্ঠার স্বরে বললে, কেন কেন? কি হয়েছে?

—ভাইয়া এই মাত্র মারা গেল।

কথাটা বলেই ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। একটু পরেই ফোন কেটে যাওয়ার শব্দ শুনে পেলে হিরণ্ময়।

শোকে পাগল অনিমেবের চেহারাটা, অনিমেবের স্ত্রীর চেহারাটা যেন কল্পনায় দেখতে পেলে হিরণ্ময়। মীনার শোকস্তব্ধ মুখ। যেন 'ভাইয়া' 'ভাইয়া' বলে চিৎকার করছে, কেঁদে লুটিয়ে পড়ছে তার শরীরের ওপর।

বাড়ি ফিরে এসে ঘড়ি দেখল হিরণ্ময়। রাত বারোটো।

পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের ওপর কৃতজ্ঞতারোধ করল। এই এত রাতেও উনি উঠে ফোন ধরেছেন, ডেকে দিয়েছেন। তাবল কাল সকালেই ধন্যবাদ দিতে হবে। কথাটা ওর সে-সময় মনেই হয়নি।

কিন্তু এত রাতে এত দূর পথ ও যাবে কি করে। বাস পাবে কি? কিংবা ট্যাক্সি। তাছাড়া এই কনকনে শীত, অসুস্থ শরীর, অসুস্থ আর ক্লান্ত।

ভাবতে ভাবতে বিছানার শুয়ে পড়ল হিরণ্ময়। তাবল, এখন গিয়ে কি লাভ, এখন কি কোন সাধনা আছে।

শরীর বড়ো অবিদ্যাসী।

শুভাকে বললে, কাল ভোরবেলাই চলে যাবো।

গিয়েছিল।

প্রতিবেশীর দল, আত্মীয়-স্বজন তখন ভিড় করে আছে।

নিজেকে বড়ো অপরাধী মনে হচ্ছিল হিরণ্ময়ের। এত দিনের এত গাঢ় বন্ধুত্ব, অথচ শুধু শরীর ভাল ছিল না বলে হাড় কাঁপানো শীতের ভয়ে ও আসেনি।

মানুষের শরীর বড়ো বিশ্বাসঘাতক।

ঘরের ভিতরে ঢুকল ও। কে যেন বললে, ডেড-বডি আনতে গেছে।

হিরণ্ময় মেঝে, অনিমেব নিশ্চুপ বসে আছে। অনিমেবের স্ত্রী যেন বসে থাকতেও পারছে না, মেয়ালে চেস দিয়ে আছে, সেখা অধীন উদাস দৃষ্টি। যেন পৃথিবী ওদের কাছে শূন্য হয়ে গেছে।

হিরণ্ময়ও চুপচাপ বসে ছিল।

কে একজন এক কাপ চা নামিয়ে দিয়ে সেল হিরণ্ময়ের সামনে, আরো যাত্রা ছিল তাদের সামনে।

অনিমেবের স্ত্রীর সামনেও এক কাপ চা দিয়ে গেল কে।

যন্ত্রের মত কিছু না বুকেই উদাস চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চায়ের কাপটা তুলে নিল অনিমেবের স্ত্রী, চায়ে চুমুক দিল।

হিরণ্ময়ের হঠাৎ মনে হল শরীর বড়ো বিশ্বাসঘাতক।

অনেকক্ষণ বসে থেকে হিরণ্ময় উঠে দাঁড়াল। বাইরে বেরিয়ে এসে এর ওর কাছ থেকে সমস্ত ঘটনাটা শুনল। ডাক্তাররা কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। অলসভাবে একটা ছেলে, ফুল থেকে ফিরল মাঝায় যত্না নিয়ে, সারা শরীর নীল হয়ে গেল, সময় দিল না, মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল।

ভাইয়া, ভাইয়া। মীনার ডাকটা ফেন কানে লেগে আছে। বহুকাল আসে শোনা। বেচারি মীনা।

কি মনে হতে আবার ভিতরে ঢুকল হিরণ্ময়। এবার ওর করে মীনাকে বুজল। ওকে একটু সান্ত্বনা দেবে। আর তো কাউকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। অনিমেবকে নয়, অনিমেবের স্ত্রীকে নয়।

হঠাৎ একটা ঘরে ঢুকে পড়ে মীনাকে দেখতে পেল। পবিত্র নিল্মাপ খেতপঙ্কজ পাশাড়া খোলা সেই বোল সতেরো বছরের মীনাকে।

কি আশ্চর্য। ওকটা অচেনা যুবক ছেলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে মীনা। রসিকতা করছে তার সঙ্গে। চোখে ঝগ, মনে নেমা।

মীনাকে দেখে মনে হল ওর দুটো চোখ, সেই পবিত্র নিল্মাপ চোখ প্রেমের নেশায় মশগুল হয়ে আছে। হাসছে।

যেন পৃথিবীতে কোথাও কিছু ঘটেনি।

সদোয়মত তার আদরের ভাইয়ার শব্দেই তখনও হাসপাতালে। মীনা হাসছে, প্রেমিকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে।

সেই ঘটনা, সেই ঘটনা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। হিরণ্ময় মনে মনে বললে, শরীর বড়ো অবিশ্বাসী। তোর কোন দোষ নেই যমুনা, শরীরের মত বিশ্বাসঘাতক অলসকেউ নেই।

লসে সঙ্গে হিরণ্ময় সতর্ক হয়ে গেল। ও কি শুভর মতই যমুনার ওপর মায়া-মমতার আঁধা হরে যাচ্ছে?

যমুনাকে এত সরলভাবে বিশ্বাস করার কি আছে। সেই ক্রিমিনারটাকে ও

এত আড়াল করতে চাইছে কেন। এই নির্মল স্নানোদয় পলিমাটিতে গড়া মূর্তিটাকে নষ্ট করে দিতে চেষ্টাছে, কে সেই কাউন্সেল। জানতে পারলে, তাকে হাতের কাছে পেলে এখনই যেন খুন করবে হিরণ্ময়।

এই সব আশেপাশের ফ্লাটিগুলোর বাসিন্দাদের মুখের ওপর দিয়ে কল্পনায় হিরণ্ময় দেখে বুলিয়ে গেল। কে হতে পারে, কে। না না, এরা কেউ নয়।

নিজের ঘরটিতে আবার ফিরে এল হিরণ্ময়। কি করবে কিছুই বুঝে পায় না।

শুভা বললে, ওর বাবার ঠিকানাটা তো রাখা হয়েছিল, তাকেই বন্ধ চিঠি দাও। এসে নিয়ে যাক তার মেয়েকে। তার ওপরে মেয়েকে।

একথাটা হিরণ্ময়েরও একবার মনে হয়েছিল। কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। ওর বাবা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে যখন দরজায় সামনে দাঁড়াবে তখন ওর দিকে মুখোমুখি তাকাতেই পারবে না হিরণ্ময়। কি বলবে ও?

একটা ভয়ও আছে। সব জানার পর হয়তো ঠেচামিটি শুরু করবে, হিরণ্ময়দেরই ঘাড়ে দোষ চাপাবে। আমরা তো আপনাদের ওপরই বিশ্বাস করে রেখে গিয়েছিলাম। বলেছিলেন মেয়ের মত। আপনাদাই তো কাচের বাসনের মত সাবধানে রাখবেন।

যমুনার মার কথাটা মনে পড়ে গেল।

একবার দেখা করতে এসেছিল, যমুনার বাবার সঙ্গে।

মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, ভাল ডাবে থাকবি, যা বলবেন ওনারা শুনবি।

যমুনা লালুক হাসি হাসছিল-সে-সব কথা শুনে।

যমুনার মা শুভর দিকে জাকিয়ে বলেছিল, আপনাদের কাছে দিয়ে গ্যালাম মা, ওর ভালটি ফলটি এখন আপনাদের হাতে।

যাবার সময় বলেছিল, একটু সাবধানে রাখবেন মা, আপনাকে আর কি কইবো, মেয়েছেলে কচের বাসন, ঠুক করলেই দশখান।

ওরা যখনই আসত, কিংবা ওর বাবা মাইনে নিয়ে যেত, শুভা খুব আদর-আপ্যায়ন করত ওদের। বলত, দরজায় দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এসে বসো।

ভেতরে ঢুকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসত ওরা।

ক্রমি তা দেখে একবার বুকি বলে উঠেছিল, দেয়ালে পিঠ দিও মা, দেয়ালে পিঠ দিও না।

শুভা যে শুভা সেও বলে উঠেছে, থাক থাক।

অথচ কে কোথায় দেয়ালে ঠেস দিয়েছে সেমিকে শুভারই বেশি চেষ্টা থাকে।

ঠিকের মেয়েটা বাসন মাজতে এসে একদিন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে, ব্রিস্কা হয়ে দাঁড়িয়ে ডান পায়ের পাতা দেয়ালে লাগিয়েছে, শুভা বী বী করে উঠেছিল।

যমুনাকেও প্রথম প্রথম সাবধান করত।

আসলে দেয়ালে মাগ লাগে, ময়লা হয় বলেই এত সাবধানতা।

কিন্তু যমুনার বাবা-মার বেলায় আপত্তি করেনি। বোধহয় ভয়, যদি অসবুদ হয়, যদি নিয়ে গিয়ে অন্য বাড়িতে লাগিয়ে দেয়। সবাই তো হনো হয়ে আছে, কাজের লোক পাচ্ছি না, কাজের লোক পাচ্ছি না। যমুনাকেও রাত্তার দু' এক বাড়ির গিগি নাকি ধরেছিল, একটা কাজের মেয়ে আছে রে তোর পোঁজো? একজন তো জিগেস করছিল, কত পাস? যমুনা কিছু বলেনি, বললেই হয়তো দল্টাকা বাড়িয়ে দিয়ে ভাঙিয়ে নিতে চাইত।

পাড়ার লোকরা সব অতুত। সব পাড়াতেই হয়তো এই রকম। বেশি মাইনেতে লোক রাখলে রাত্তার দেখা হলেই বলবে, আপনাদের আছে দিচ্ছেন, কিন্তু এভাবে বাড়িয়ে গেলে তো আর লোক রাখাই যাবে না। পাড়ার সবাই যদি এক মাইনে না দেন...

অথচ কম দিলে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবে। কিংবা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে, কি হাড়কল্লুস লোক মশাই, এত বাটায়, আর মাইনে দেয়...

আজকাল আবার আরেক খামেলা হয়েছে, স্বামী স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করে, আলাদা ফ্যাটে থাকে। বাচ্চা রাখার জন্যে, রান্নাবান্না করার জন্যে কাজের মেয়ে রাখে। সারাক্ষণের লোক। বেশি মাইনে দিতে তো ওদের গায়ে লাগে না, দু'জনের রোজগার।

দায়ে পড়েই যমুনার বাবা-মাকে এত আদর-আপ্যায়ন।

ভেতরের প্যাসেজটায় বসিয়ে চা-জলখাবার দিত, বাড়িতে মিষ্টি থাকলে দু' একটা মিষ্টিও।

একবার তো ডাইনিং টেবলের চেয়ারটাতে বসতে দিয়েছিল, এখানে বসো, এখানে বসো। সেটা দেখলে ঠেস দেবে এই ভয়ে, না একটু বেশি আদর-আপ্যায়ন দেখানোর জন্যে, তা অবশ্য খোকা যায়নি।

ক্রমি একটু চটে গিয়েছিল। ও এসব আনিখোতা পছন্দ করে না। কাজের

লোকের বাবা-মাও তো কাজের লোক। ও চায় ওরা একটু নিচু হয়েই থাকুক।

বলেছিল, মা, তুমি ওদের কিছু মাথায় তুলছ।

শুভা রেগে গিয়ে বলেছিল, তুই তো এক গ্লাস জল গড়িয়ে বেতে পারিস না। আমার কথা আমাকে ভাবতে দে।

এখন আর মাথায় তোলার প্রসঙ্গই ওঠে না। মাথার ওপরেই যেন ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

যমুনাকে যত না ভয়, যমুনার বাবা-মাকে তার চেয়েও বেশি।

না জানি এসে সব খবর শুনলে কি করে বসবে। হয়তো চিংকার করে পাড়ার লোক জড়ো করে ফেলবে। তারপর কি হবে হিরণ্ময় ভাবতেও পারে না। সকলে তো বলবে ওরই দোষ, বাপ-মা বিশ্বাস করে রেখে গেল, আপনারা তো তাকে সাবধানে রাখবেন।

মেয়েছেলে কাচের বাসন, ঠুক করলেই দশখান। যমুনার মার কথাটা মনে পড়ল।

তবু ওর বাবার দেওয়া ঠিকানাটা আছে কিনা দেখার জন্যে হিরণ্ময় উঠে গেল। কপাটের আড়ালে রাখা তারের ফাইলটার রাজ্যের কাগজপত্র গাঁথা থাকে। অনেককাল ধরে খুঁজল হিরণ্ময়, পেল না। না পেয়ে যেন বানিকটা বড়ি।

শুভা হঠাৎ বললে, শোনো, ছবি তো তোমার খুব বড়, ও তো ডাক্তার।

সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময়ের মনে হল ও যেন একটা মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছে। কি আশ্চর্য, ছবির কথা ওর এককম মনে পড়েনি। হয়তো অনেককাল দেখা নেই বলেই।

শুভা বললে, কালই চলে যাক। আর গড়িমসি করো না, সময় চলে যাচ্ছে।

॥ চার ॥

যমুনাকে ও এ কদিন দেখিনি, কিংবা দেখতে পায়নি। মেঘের চেষ্টাও করেনি।

এক একবার ইচ্ছে হয়েছে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, প্রণাম করে। যা জানবার জ্ঞানে নেয়। কিন্তু শুভাকেই যখন বলেনি, তখন হিরণ্যের কাছে কি মুখ ফুলাতে পারবে ? ও তো আরো লজ্জা পাবে। তবে ধর্মকথামক দিলে হয়তো কথা বেরোতে পারে। একটাই ভয়, নিজেকে। কখনো কখনো শুভাও ওপরেও।

ধর্মকথামক ও কবি টু লক্ষ্য না করে, হিরণ্য না রোগে গিয়ে চড়াচাপড় দিয়ে বসে। প্রত্যেক বড় একটা মেঘের পায়ে হাত তোলার, সে তো আরো ভয়ঙ্কর। আরেকটা ভয়, যমুনা না হাউ হাউ করে কেঁপে ওর পা জড়িয়ে ধরে বলে বসে, আমাকে বাঁচান বাবু, আমাকে বাঁচান। তখন আর হিরণ্য এক কঠোর থাকতে পারবে না।

যমুনা এ কদিন ধরেই কাঁদছে ও আসেনি। লুকিয়ে লুকিয়ে আছে। কিংবা শুভাই হয়তো ওকে ধারেকাছে আসতে দিচ্ছে না।

আগ্নিস থেকে ফেরার পর প্রতিদিনের বঙ্গচ চা আর ঝুঁটি তরকারি, কোমলদিন দু'খানা লুচি আলুর দম, একদিন মাছের কিংবা মোচার চপ, এ সবই বানা যমুনা, নিয়ে এসে দিত সে-ই। শুভা ঘেঁষে ধরে দিনে দিনে ওকে শিখিয়েছিল বাত, মাছের চপটা দারুণ হয়েছে। তুই করেছিস ?

লাজুক লাজুক মুখে হাসি, ঘাড় কাত করে 'হ্যাঁ' বলেই লাফাতে লাফাতে ছুটে পালাত। গিয়ে শুভাকে বলত, বাবু বলছে খুব ভাল হয়েছে। কি বুশি !

সেই যমুনা এখন আর কাছেই আসে না। আসে না সেও এক স্বতি।

শুভাই এনে দেয়। রান্নাবান্না অবশ্য যমুনাই করছে, আশ্রয়ে বুকতে পারে। একটা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা কিংবা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েটা স্নান হয়ে গেছে বলেই যে কাছ থেকে রেহাই পাবে তা তো নয়।

—আমার কিছু আগে থেকেই কেমন সঙ্কেত সঙ্কেত ঠেকছিল।

দুঃসংবাদটা দেওয়ার পর শুভা একদিন বলেছিল।

—কই বলোনি তো কোনদিন। তা হ'লে তো আগেই তাদানো যেত।

—নিশ্চিত না হয়ে পরের মেয়ে সম্পর্কে যা-খুশি বলা যায় ! শুভা ধর্মমন্ত্রে মুখে বলেছিল, কিছুদিন থেকেই দেখছি ওকে কেমন যেন আলসেমিতে পেয়ে বসেছে। কাজ ভুল করছে, কান্না দিচ্ছে। এ কদিন তো দেখছিলাম, যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ছে।

হিরণ্যর ধরে নিয়েছিল সেজনেই হয়তো শুভা চা-জলখাবার নিয়ে এল।

সদ্য সদ্য দুঃসংবাদটা শুনেছে শুভার কাছ থেকে। তখন হিরণ্যর একেবারে ধসে পড়া মানুষ। বিভ্রান্ত, বিধ্বস্ত। কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না।

'তাড়িয়ে দাও, ওকে এখনই তাড়িয়ে দাও', রাগের মাধ্যম বলেছে। কিন্তু তাদানো যে সহজে যাবে না তাও জানত।

চুপচাপ বসে কাটিয়েছে রাত দশটা পর্যন্ত।

এমনতেই চাইনীজ খেয়ে এসেছিল উমেশের জেদাজেদিতে। শুভার কাছে সে-কথা বলার সুযোগও ঘটেনি। ক্রিদেও ছিল না।

রাতের খাবার দিয়ে শুভা ডাকল, খাবে এসো। চিংকার করে বললে, কিছু রুমি খাবি আয়।

মেয়েরা কেমন যেন যন্ত্রের মত। এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে, কিন্তু কাজকর্মগুলো শুভা ঠিকঠিক করে যাচ্ছিল।

হিরণ্যর উঠে গিয়ে ডাইনিং টেবলে বসল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। খাব না, খিদে নেই, বলতে পারল না।

রুমি এস-সময় রোজই ঘুমিয়ে পড়ে, ওকে ডেকে ডেকে ভুলতে হয়।

শুভা আরো দু'বার হাঁক দিতেই কিছু আর রুমি এসে বসল। রুমি তখন চোখ রক্তাভাচ্ছে।

শুভা খালা নামাল।

কিছু বলে উঠল, ও কি, তুমি দিচ্ছে কেন মা, যমুনা কি ভাগলবা নাকি ?

কিটুর কথাবার্তা ঐ রকমই।

শুভা রোগে পেল, কেন আমি দিচ্ছে কি তোদের মুখে কচবে না ?

ভাতে হাত না দিয়ে পটল ভাজাটা চিবোতে চিবোতে কিছু বললে, আঃ লাভলি, রক্তবে না মানে, তোমার রান্নার হাত যদি গ্রাস্ত ওবেরর জ্ঞানত, তা হলে তো তোমাকে ওরা হেড-কুক বানিয়ে দিত।

অন্যান্য দিন কিটুর এ ধরনের কথায় হিরণ্ময়ও মজা পেত। বিশেষ করে ও যখন ওর মাঝে ক্যাপাবার চেষ্টা করত।

কিন্তু হিরণ্ময়ের অসহ্য লাগছিল। ওর বৃকের মধ্যে তখন একটা ধক্ধক্ আওয়াজ।

রেগে গিয়ে বললে, নে নে জ্যাঠামি করতে হবে না, থেয়ে নে।
কিটু তো জানে না কি ঘটে গেছে। তাছাড়া বাবাকে ওরা ভয়ও পায় না।
বিবি প্রভায় পেয়ে এসেছে বলেই।

হিরণ্ময়ের ধমক শুনে মাঝে ছেড়ে আখো ঘুমন্ত রুমির দিকে মন দিল।
বললে, রুমি, সাইলেন্টলি থেয়ে নে, বাপী আজ আউট অফ মুড।

বলেই ওর পাতের মাছটা তুলে নিল।
সঙ্গে সঙ্গে রুমি কগড়ার ভঙ্গিতে ঠেঁচিয়ে উঠল, দেখলে মা, আমার মাছটা...

—ও, তুই বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও দেখতে পাস?
বলে মাছটা ফেরত দিয়ে দিল।

হিরণ্ময়ের ভাল লাগছিল না। অথচ এ-সব ও বেশ উপভোগই করে। এই
ভাই-বোনের কগড়াঝাট, কিটুর মজার মজার কথা।

কিটু আবার বললে, তোমার সেই জমিদার-কন্যা কি ছেড়ে চলে গেছে?
শুভা তার কথার উত্তর দিল না।

জমিদার-কন্যা মানে যমুনা। ওরা দু'ভাইবোনে কাজের লোকের সঙ্গে এমন
ব্যবহার করে, এমনভাবে হুকুম চালায় যেন সে কাজের লোক ছাড়া কিছু নয়।
জল চাইলে, দু'মিনিট দেরি হ'লে হস্তিতত্ত্ব। সে যে রান্নাঘরে কড়াইয়ে কিছু
চাপিয়েছে, সে হিসেব রাখে না।

যমুনা তখন সদ্য এসেছে। দু'দুটো মাস নাছেহাল হয়ে গিয়ে শেষ অবধি
কাজের মেয়ে একটা জুটেছে।

রুমি কি জানে যেন ওর ওপর হুকুম চালাচ্ছিল ধমকের ভঙ্গিতে।
শুভার ভয়, ওদের জন্যে শেষে না এ মেয়েটাও পালায়। তাই বলেছিল,

ওভাবে কথা বলিস না। ওরা কখনো পরের বাড়িতে কাজ করেনি, দেশে গিয়ে
জমিজমা ছিল, ওর বাবাও ভাল রোজগার করত। তারা থেকে পড়ে গিয়ে...

সেই শুরু। মাঝেসাঝেই তাই কিটু ঠাট্টা করে বলত, যমুনা তো কাজের
লোক নয়, মায়ের গ্রামের জমিদারের মেয়ে।

'জমিদার-কন্যা' কথাটা শুনে শুভা মুহূর্তের জন্যে রেগে গিয়েছিল। তবু
সামলে নিয়ে বললে, ওর শরীর খারাপ।

—ওঃ, তাই বলা। তোমার তো কাজের লোক দু'মাসের বেশি ঠেকে না,
তাই ভাবলাম ভাগলবা বুঝি।

শুভা বললে, ঠেকে না তোদের জন্যেই।
ব'লে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

হিরণ্ময়ের বিশেষ ছিল না, ও উঠে পড়ল। বেশ বুঝতে পারল, যমুনা ওদের
সামনে আসতে পারছে না। লজ্জায়, ভয়ে।

আড়ালে আড়ালে থাকছিল।
সেজন্যেই হিরণ্ময় এ কদিন যমুনাকে দেখেনি। সেখান চেষ্টাও করেনি।

শুধু একবার এক কলকের জন্যে চোখে পড়েছিল।
হিরণ্ময় জান করে মাথায় তোরালে ঘসতে ঘসতে কলঘর থেকে বেরিয়ে

আসছে, রান্নাঘরের দিকে চোখ গেল। রান্নাঘরের বাইরের বারান্দায় বসে আছে,
দু'হাটুর মধ্যে মুখ ডুবিয়ে। কান্না চেপে, নাকি ওর দরজার ছিটকিনি খোলার

আওয়াজ শুনে মুখ লুকোবার জন্যে, তা অবশ্য বুঝতে পারেনি।
ও মুখ তুললেই চোখোচোখি হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে হিরণ্ময় দ্রুত পারে

নিজের ঘরে চলে এসেছিল।
সেই যমুনার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি, সিঁড়িতে।

অন্য দিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছিল। আগের দিন রাত থেকেই
ভেবে রেখেছিল দেরি করে আশিসে যাবে। আর তো দু'বছর, তারপরই
রিটারায়মেন্ট। দরকার হয় ক্যান্সার নিয়ে নেবে। পুরো দিনই ছুটি নিয়ে
নেবে।

হিরণ্ময়ের নিজেরই আশ্চর্য লাগছিল। দু'দিন আগেও ওর বৃকে চেপে
বসেছিল একটাই দৃষ্টান্ত। রিটারায়মেন্ট। বারবার হিসেব কবেছে ওর সামান্য
যা জমানো টাকা আছে, আর পি এফ, গ্র্যাচুইটির টাকা তুলে নিয়ে বাকি জীবনটা
কিভাবে কাটাবে। সংসার চলবে কিনা। এক সময়ে একটা ছোটখাটো ক্লাসিক
কেনারও বাসনা জেগেছিল, সম্ভব নয় বুঝে গেছে বলেই এখন আর চিন্তাও করে
না। এখন মনে মনে শুধু হিসেব করে রিটারায়মেন্টের পর কোন কোন খরচ
কমানো যাবে। যাবে কি।

হিরণ্ময়ের নিজেরই আশ্চর্য লাগল, ভবিষ্যৎ ভেবে যে নিরাপত্তার অভাবে ও
ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ছিল, ইঠাৎ এই নিপদের মুখে পড়ে সেই ভয়টো
কোথায় উবে গেছে। এখন আর রিটারায়মেন্ট ওর কাছে কোন ভয়ই নয়।
টাকাপয়সা সব তুচ্ছ হয়ে গেছে।

এখন ভয় একটাই। আত্মসম্মান বাঁচানো।

আত্মসম্মান। কে কি ভেবে বসবে, কে কি বলে বসবে। পাড়ায় যদি জানাজানি হয়ে যায়।

ভয় যমুনার বাবা-মাকেও। ওর দিদিটা যদি এসে হাজির হয়, কি জানি কি রকমে বসবে।

হিরণ্ময় একবার ভাবার চেষ্টা করল ওর বাবা-মা খুঁতমি করে ওকে কোন পাঁচে ফেলতে পারে কিনা। এ নিয়ে কি কোন যামলা মোকদ্দমা করতে পারে। আইন তো জালমত জানে না ও।

সিকিউরিটি। নিরাপত্তা। এই সব নিয়েই এতদিন ভেবেছে। এখন সেটা একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে, কারণ চোখের সামনে এখন আত্মসম্মান বজায় রাখার প্রশ্ন। বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়াই এখন বড় সমস্যা।

মধ্যবিত্ত মানুষ নাকি নিরাপত্তার অভাব নিয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। সব সময় ভয়, চাকরিটা থাকবে তো। চাকরি থাকলেও মনে ভয় এই চেয়ারটা থাকবে তো। চাকরি থেকে অবসর নিয়েও ভয় পিছু ছাড়বে না। সংসার চলবে তো। যাদের প্রচুর আছে তাদের বোধহয় এ-সব ভয় থাকে না। যাদের নেই, তাদের কিছু হারাবার ভয়ও থাকে না।

ভয় থাকে না ঠিকই। তবে জমিজমিরেত চলে গেলে, কিংবা ভাড়া থেকে পড়ে গিয়ে পা খোঁড়া হলে তাদের বাড়ির নিষ্কাশন সরল গ্রামা মেয়েটাকে পরের বাড়িতে এই পাঁকে ডোবা শহরে এসে বি-গিরি করতে হয়। আর মনিবের ফরমাশ বাটতে বাটতে কখন পিছলে পড়ে গিয়ে দু'হাটুর ফাঁকে মুখ ডুবিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কাদতে হয়।

হিরণ্ময়ের কাছে নিরাপত্তার চেয়ে আত্মসম্মানই বড় হয়ে উঠেছে। সারাজীবন যৌথত্ব মধ্যবিত্ত মানুষকে, নিরাপত্তার অভাব নয়, আত্মসম্মানই ত্যাগ করে কেড়ায়। আপিসে, পাড়াপাড়ীল কাছে, আত্মীয়বন্ধন বন্ধুবান্ধবের সামনে। তোষামোদে কাজ হয়, কিন্তু ওপরওয়ালাকে তোষামোদ করতেও ভয়, কলিগরা বলবে, লোকটার কোন সেন্স্‌-রেনসেই জ্ঞান নেই, পাড়া-পাড়ীল কাছে গিয়ে বলা যাবে না, মশাই, কাজের মেয়েটা একটা কাণ্ড করে বসেছে, কি করা যায় বলুন তো। ভয়, সব জেনে গিয়ে পাঁচকল করাও, কি না কি বলে বসবে। আত্মীয়বন্ধন মানেই তো গুপ্তশত্রু, লুকিয়ে হাসাহাসি করবে, ঘরে একটা জোয়ান ছেলে, চটকদার একটা কাজের মেয়ে রেবেছে, লজ্জাও করে না।

রাজ্যের মুক্তিস্তা আর ভয় নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ছিল হিরণ্ময়।

—শোনো, ছবি তো তোমার খুব বন্ধু, ও তো ডাক্তার।

শুভা বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময়ের মনে হয়েছিল ও যেন একটা মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছে। আশ্চর্য, ছবির কথা ওর একদম মনে পড়েনি, হয়তো অনেককাল দেখা নেই বলেই।

একসময় খুব বন্ধু ছিল, তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

একে অনেক দূরে থাকে, তার ওপর মাঝখানে কয়েক বছর আপিসের কাজের চাপে যোগাযোগ রাখতে পারেনি। বিকাশের সঙ্গে আড্ডায় ছেল পড়েছিল সেই কারণেই।

বিকাশের এখন গাড়ি-বাড়ি। এই ক্ল্যাটে নিয়ে আসতেই সেদিন লজ্জার একশেষ।

কি অপমানটাই না করেছিল বাড়িওয়ালা বীরেশ্বরবাবুর মস্তান ছেলেটা। বাটা লছমন, ঐ বিহারী চাকরটা, সে তো আরেক কাঠি আগে যায়।

হারামজাদা। নটা থেকে দশটা, এক ঘণ্টা টিউবওয়েল খুলে রাখার কথা, বাটা সাড়ে নটায় কোন কোনদিন চেন লাগিয়ে তালা দিয়ে দিত। কি না, বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কিংবা, কেউ জল নিতে আসেনি, ভাবলাম সবাই নিয়ে গেছে।

প্রথম প্রথম কি আমেলাই না করত।

ইসানীং আর তেমন অসুবিধে ঘটাত না। এক একদিন সন্ধ্যার পরও চাবি খুলে দিত। যমুনা গিয়ে জল নিয়ে এসেছে। পরমের দিনে সকালে এক কলসী জল আনলেই তো রাত অবধি চলে না।

শুভা একদিন যমুনাকে বলেছিল, তুই গিয়ে একটু ইনিয়ে বিনিয়ে বল না, দেখ চাবি খুলে দেয় কিনা।

দিয়েছিল। মাঝে মাঝেই দিত।

এক কলসী খাবার জলের জন্য বাড়িওয়ালার চাকরটাকে তোষামোদ করতে হয় দেখলে বিকাশের কাছে আর আত্মসম্মান থাকত না।

সেদিন বাড়িওয়ালার মস্তান ছেলেটা তো স্নিতিমত অপমান করেছিল, বিকাশ গ্যেটের সামনে পাড়ি রেখেছিল বলে। সেটা তো বিকাশকে অপমান নয়, বিকাশের সামনে হিরণ্ময়কে অপমান।

তার আপিসে কিংবা বাড়িতে সময় পেলেই যেতে বলে গিয়েছিল বিকাশ। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও হিরণ্ময় যেতে পারেনি, ঐ অপমানটার জন্মেই।

ছবির সঙ্গে দেখা করবে বলেই তাড়াতাড়ি বের হচ্ছিল। বিকাশের কথাও

মনে পড়ে গেল। বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশি, ভাবল ওকে বললে হয় না? ও হয়তো কোন উপায় বাতলে দিতে পারে।

বাড়িতেই চেয়ার হাফির। হয়তো রুগীর জিড় থাকবে।

মনে মনে ভাবল, কতদিন তো দেখা নেই, সেও বোধহয় এখন জের প্রাকটিস চালিয়েছে। বাড়ি-গাড়ি করে ফেলেছে। সময় দিতে পারবে কিনা কে জানে। অন্য রুগীর সামনে তো আর বলা যাযে না।

হিরণ্ময় হাফির সঙ্গে দেখা করবে বলেই বের হচ্ছিল।

মিড়ির বাঁকে যমুনার সঙ্গে মুখোমুখি।

হিরণ্ময় নামছিল, আর যমুনা এক কলসী জল নিয়ে ওপরে উঠছিল।

সামন্যসামনি হতেই যমুনা ঝট করে মাথা নামিয়ে নিল।

সম্ভোচ হিরণ্ময়েরও। এতকাল দেখেছে, সামন্যসামনি কথা বলেছে। কিন্তু হিরণ্ময় ওকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল, পাশে সরে দাঁড়াল। আর যমুনা তরতর করে উঠে গেল।

যমুনা আসার পর এই একটা সমস্যা মিটে গিয়েছিল। ঠিকের লোক একটা আছে, সকালে এসে বাসন মেজে দেয়, ঘর মুছে দেয়। কিন্তু তার আনা জল শুভা খেতে পারে না। বলে, কি নোংরা কি নোংরা, ওর আনা জল খাওয়া যায় নাকি।

আরেকটা সমস্যা ছিল। র্যাশন আনা।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ল, র্যাশন আনতে গেলেই অনেক দেরি করে ফিরত যমুনা। শুভা বকাবকি করলে হেসে বলত, লাইনটা গিয়ে দেখুন না, শিবমন্দির অবধি চলে গিয়েছিল।

কারো কোন সন্দেহ হয়নি। কথাটা তো মিথ্যে নয়। র্যাশন আনা মানোই একটি ঘণ্টা। কিন্তু এখন হিরণ্ময়ের সন্দেহ হচ্ছে, ঐ র্যাশন দোকানেরই কেউ নয় তো।

শুভা একদিন বিরক্তির সঙ্গে বলেছিল, এ এক কালতু ক্যামেলা, এই র্যাশন। কর্তৃগুলো ছিড়ে ফেলে দিলেই হয়।

—না-না না। বাধা দিয়েছে হিরণ্ময়।

র্যাশন দোকান থেকে কিছুই নেয়া হয় না। ওদের চাল তো মুখে দেওয়া যাযে না, স্টেলটেলে বিশ্বাসও করে না কেউ। কলচিচ চাম নিয়েছে। কিন্তু কার্ডগুলো তো চালু রাখতে হবে, কি জানি কখন কি কাজে লাগে যাবে। শুনেছে তেও অনেক কথা। জমি রেজিস্ট্রি করতে গেলে কোন কোন রেজিস্ট্রার নাকি

চেয়ে বসে। পাশপোর্ট চাইতে গেলে। না থাকলে কখন কি বিপদে পড়বে কে জানে। সেজন্যেই এ ঝঞ্জাট। মাথা পিছু একশো চিনি পাওয়া যায়, দুপুরের মত, চায়ের দিলে এক মুঠো দিতে হয়। তবু নিতে হবে, কার্ড চালু রাখতে। না নিলেই কার্ড বরবাদ। যে কার্ড কোন কাজে দেয় না, তার জন্যে হুণ্ডার সেড দু'ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কাজের লোককে। যাদের কাজের লোক নেই, কাজের লোক নিজেদেরই দাঁড়াতে হয় লাইনে। তাদের এক ঘণ্টা সময়ের দাম কি কম?

র্যাশন দোকানের যে লোকটা বসে বসে বিলু কাটে, মধ্যবন্ধ, তাহেই সন্দেহ হল। কপালে তিলক কাটা, বাঙালী। ঐ মালিক কিনা কে জানে।

একবার হিরণ্ময় গিয়েছিল খোঁজবর নিতে। —আজ্ঞা, মাসে শুধু একবারই র্যাশন তুললে হয় না; কার্ড চালু রাখার জন্যে?

লোকটা তখন একটা বছর তিরিশ বয়সের কাজের মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছে। মেয়েটাও বেশ অকলঙ্কি করে গল্প করছিল। হেসে হেসে কথা বলছিল।

তিলক-কাটা শেষে বললে, দিয়ে দিচ্ছি, টাকাটা পরের হুণ্ডাতেই দিয়ে দিস।

বেশ বোঝা গেল, মেয়েটার র্যাশন তোলার টাকা নেই। ধার চাইছে।

র্যাশন দোকানের লোক এত দয়ালু হয় জানা ছিল না। ওরাও ধার নেয়? কেন দিল তা বোঝাই গেল।

তিলক-কাটা রসিকতায় এতই মেতে ছিল, যে হিরণ্ময় দাঁড়িয়ে আছে একটা কথা বলবে বলে গ্রহণই করল না।

এদিকে লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলো চেষ্টাচ্ছে। লাইনে দাঁড়ান, লাইনে দাঁড়ান। যেন হিরণ্ময় র্যাশন তুলতে এসেছে।

মেয়েটা চলে যেতেই হিরণ্ময় আবার বললে, মাসে একবার র্যাশন তুললে হয় না, কার্ড চালু রাখার জন্যে?

—না স্যার।

তিলক-কাটার মুখে এতকাল মাখন মাখানো রসগোল্লার রসে ডেজানো কথা গলে গলে পড়ছিল অনর্গল। মেয়েটা চলে যেতেই গলার স্বরও বদলে গেল। ধারে র্যাশন দিতেও যাকে অকুণ্ণ হতে দেখেছে এই মাত্র, হিরণ্ময়ের বোলায় কথা খরচ করতেও সে লোকটার কার্পণ্য।

সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে এই আশা করেই হিরণ্ময় এসেছিল, হতাশ হতে হ'ল বলে বেশ বিরক্তির সঙ্গে বললে, কি যে আপনাদের সিস্টেম!

লোকটার কানে গেল। মাথা না তুলেই ক্যাল মেমো লিখতে লিখতে

বললে, গরমেটকে বলবেন যান।

চলে আসতে আসতে ও বললে, গরমেটের কি ব্রেন বলে কিছু আছে।
এক ভদ্রলোক, লাইনেই ছিলেন, বললেন, ব্রেন ঠিকই আছে দাদা। খাটছে
কন্যাদিকে। আমরা তো লাইনে দাঁড়িয়ে কার্ড চালু রাখছি, কিন্তু আমাদের নামে
মাল ঠিকই চলে যাচ্ছে ব্যাকে।

হিরণ্ময় হাসতে হাসতে চলে এসেছিল।

এতকাল মনে পড়েনি। এখন মনে পড়ে গেল। মনে পড়তেই শিউরে
উঠল।

ঐ শালা তিলক-কাটা নয় তো!

যমুনা তো সব সময়েই বলত, কি লম্বা লাইন।

ফিরত এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পরে। কেউ কিছু সন্দেহ করত না। শুভা যদিবা
কখনো কখনো জিগ্যেস করেছে, এত দেরি হল কেন, তাও অন্য সন্দেহ থেকে।
ডেবেছে হয়তো কাকের মেয়েদের জটলায় আড্ডা দিয়েছে, আর তারা মাথায়
দুর্ভিক্ষ ঢোকান্ধে। মাইনে বাড়িতে হয় কি করে, শেখান্ধে। আর নয়তো লোভ
দেখান্ধে, ছেড়ে আয়, ভাল বাড়ি দেখে দোব।

বাসে উঠে মনে মনে ভাবল, শুভাকে বদতে হবে। জিগ্যেস করে দেখুক,
রায়ান সোকানের লোকটা কিনা। ধরা পড়ে গেছে বুঝলে হয়তো স্বীকার করবে।

ও তো বলেছে এই বাড়িরই লোক, অথচ নাম বলেনি। নিখাৎ ওটা মিথো
কথা। চাপে পড়ে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। এই বাড়িরই লোক! তাহলে নামটা
বলছে না কেন?

কেন যে বলছে না তাও এক রহস্য। কোন একটা নাম বলে দিলে এত ভয়
থাকত না। কিছুটা নিশ্চিত হতে পারত। দু' পাঁচজনকে ডেকে নিয়ে তার কাছে
গিয়ে হামলা করাও যেত।

তবে লাভ কিছু হ'ত না। মেয়েটাকে তো এখন বাঁচতে হবে।

ওদের সমাজ-টমাজ কেমন ঠিক জানে না। আমাদের মতই হবে হয়তো।
ভাবল হিরণ্ময়। তবে ঠিকের লোকগুলো যারা এই এসেছে, মাঝেমাঝেই তো বদল
হয়, সব এক পল। কোলে বাজা নিয়ে কেউ নিজেই চলে এসেছে স্বামীর কাছে
মারধোর খেয়ে, কাউকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন ঠিকৈ-ঝি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর
থাকে না। দু-একজন অবশ্য নিজেরা রোজগার করে অক্ষম কিংবা মাতাল
স্বামীকে ঝাণ্ডায়।

উমেশ আর সুধাকান্ত সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তর্ক করতে করতে একদিন

ঐমেশকে সুধাকান্ত বলেছিল, আমরা তো শুধু আমাদের কথাই বলি, সমাবিশ্বের
কথা, এদের কথা তো বলেন না দাদা।

উমেশ রসিকতা করে উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, আমাদের এই সিস্টেমটাই
ভাল সুধাকান্ত। এই সিস্টেম না থাকলে তাবো তো দশ বিশ লক্ষ ঠিকৈ-ঝি
আমরা কোথায় পেতাম? কে সাগ্রহী দিত?

একটু থেমে বলেছিল, কোলকাতায় নিত্যমিন সকালে কতগুলো ঠিকৈ-ঝির
স্পেশাল ট্রেন আসে জানো? তার ওপর বস্তুগুলো।

এলোপাথাড়ি এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন পৌছে গেছে খেয়ালই
করেনি হিরণ্ময়।

কনুইয়ের ঠোঁট দিয়ে ভিড় ঠেলে, কারো পা মাড়িয়ে ঝড়মুড় করে নেমে
পড়ল। পিছনের রাগী উত্তেজিত হল-ফোটানো অশালীন কথাগুলো শুনেও
শুনল না।

হাষি এখন ওর সামনে ঘোড়ের মুখে ঝড়কুটো। ওদের সংসারে তো এখন
একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। সারাক্ষণ ভয়-ভয়, কেউ না কিছু জেনে যায়।
বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, একটা আতঙ্ক। এই না যমুনার বাবা-মা এসে দাঁড়ায়।
কিংবা কনবানে দিদিটা।

ভূত দেখার মত ভয় নিয়ে তাকাতে হবে।

কাউকে যে-কথা বলতে পারেনি, হাষিকে অনায়াসে বলতে পারে। ও হয়তো
একটা উপায় করে দিতে পারবে। তাছাড়া এখানে-ওখানে বলে বেড়াবে না।
হাষি অনেককালের বন্ধু। কিন্তু এতকাল দেখা নেই, হঠাৎ গিয়ে হাজির হতেও
সম্ভব। হয়তো ভাববে, কাজ পড়েছে তাই এসেছে।

নীচের তলায় চেষ্টার।

টুকেই মনটা মুষড়ে পড়ল।

চেষ্টারের সামনে ছোট বসার ঘরখানা এককালে, প্র্যাকটিস শুরু করার সময়,
খুব ভাল করে সাজিয়েছিল হাষি। হিরণ্ময় এসে দেখে গিয়েছিল।

একটা দেয়ালে দেয়াল-কোড়া ওয়াল পেপার, সুন্দর ডিজাইন, শিলিং অবধি
একখানা সুন্দর ছবির বকরকে খ্রিস্ট। ফোমের গদি আটা পোশাক-কুশন, মডার্ন
ডিজাইনের। না, ফোম নয়, তখন বোধহয় ডানলোপিলো ছিল।

চিনতে অসুবিধে হ'ল। সে ঘরখানাই নয় যেন। ভুলে অন্য কোথাও টুকে
পড়েনি তো।

না। সেটাই।

খুলো পড়ে পড়ে দেয়ালের ওয়াল পেপার আর ছবি প্রভৃতি গুহাচিরের দ্যেত
বিকর্ণ, লুপ্ত। খুঁজে বের করতে হয়। শোকা-কুশনের নোংরা চেহারা দেখে
মলতে ভয় হবে রুগীদের, এখান থেকেই না কিছু ইনফেকশন নিয়ে যেতে হয়।
স্নেকের কাপেটি-পানের পিক, খুলো, শুকিয়ে যাওয়া জুতার কাপা, আরও কত
কি।

অনিচ্ছা এসিয়ে যেতেই চেহাদের ভিতরটা দেখতে পেল।

সুইং ডোরেয় আধখানা নেই, বাকি আধখানা কজা ভেঙে ফুলছে।

ছবি বসে আছে। সামনের টেবিলে জুপীকৃত কি-সব কাগজপত্র। শুধু
কোম্পানির বিজ্ঞাপনের।

হিরণ্যকে দেখেই ভিড়িং করে উঠে দাঁড়াল ছবি। —আরে হিরণ, তুই! কি
মনে করে। আর আর।

হিরণ্য হাসি হাসি মুখে হিরণ্যটিতে তাকিয়ে রইল ছবির মুখের দিকে।

বললে, আমিও খুব বুড়িয়ে গেছি, না রে।

—বোস্। বোস্।

ছবি নিজেও বলল। তারপর হাসতে হাসতে বললে, ইউস্ এ ক্রেডার ওয়ে
অফ সেয়িং হোয়াট ইউ মীন। মানে বলতে চাইছিস আমি বুড়িয়ে গিয়েছি, এই
তো?

হিরণ্য বললে, না।

ও তখনো ছবিকে দেখছে। হাসতে হাসতে বললে, জানিস ছবি, আয়নাও
মিথ্যা কথা বলে। নিজেই ব্রোজ দেখছি, কিন্তু ধরতে পারিনি আমি বুড়ো হয়ে
গেছি। তোকে দেখে বুঝতে পারলাম।

বছর তিনেক আগে, পাঁচও হতে পারে, শেষ দেখা-নিউ মার্কেটে। এখন
দেখল, ছবির মুখে বার্বেকোর রেখা পড়েছে, মাথার মাকখানাটা চুল উঠে গিয়ে
টাক বড়ো হয়েছে। বিকৃত টাক ঘিরে যা চুল আছে তার সবই প্রায় সাদা। মাত্র
এই কটা বছরে।

—বাঃ কি যে বলিস্, ইউ আর কোয়াইট ইয়াং। মানে আমার তুলনায়।

হিরণ্য হাসল। মললে, ছায়ায়। দু'বছর পরেই স্কোর হয়ে যাচ্ছি।

—রিটার্ন করছিস?

—হ্যাঁ।

ছবি কেমন আনমনা হ'ল। বললে, আমি তো জন্ম-বেকার। কাকে কি
শেনাচ্ছিস।

হিরণ্য বুঝতে পারল না ছবি কি বলতে চায়। ও ভাবল ছবি জে কোনদিন
জাকরি করেনি, হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হয়নি, সে কথাই বলছে।

ও ততকালে বাড়ি ঘুরিয়ে ঘরখানা দেখছে, টেবিল চেয়ার, খোলা দরজা দিয়ে
রুগীদের বসার ঘরখানা যতখানি দেখা যায়।

খুব খারাপ লাগছিল। বলেও ফেলল, কি করে রেখেছিস। খুলোয় ঢেকে
আছে যে সব। বাড়িশৌধ করাতে পারিস না। কি সুন্দর চেহারা ছিল, তখন। ও
ঘরে ওয়ালপেপার, ছবি।

বিষয় হাসি হাসল ছবি। —এ কুশন-টুশন? দু'একজন রুগী এলে তারাই
জামাকাপড়ে খুলোগুলো নিয়ে যায়।

তখনো হিরণ্য ভাল বুঝতে পারছে না। বললে, আমি তো ভেবেছিলাম
তোর সঙ্গে কথা বলতেই পাব না, রুগীতে গিজগিজ করছে ঘর।

অটোহাস করে হেসে উঠল ছবি।

—খুব টাকা করছি তাও নিশ্চয় ভেবেছিস?

—হ্যাঁ। করারই তো কথা। আজকাল ডাক্তারদের তো পোয়াবারো। পাঁচ
সাত বছরে বিরাট বড়লোক হয়ে যায়। বাড়ি করে গাড়ি করে। ছেলেমেয়েকে
আমেরিকা পাঠায়।

ছবি কলমটা নিয়ে টেবিলের ওপর পাতা কাচটায় ঠুকল।

বললে, সবই সত্যি। তবে শুধু ফর লাকি ফিউ। ভাগ্য কয়েকজনকে
বড়লোক করে দেয়, আর কয়েকজন হয় যোগ্যতায়। কিন্তু আসলে প্র্যাকটিস
জন্মতে হ'লে চাই হাসপাতাল।

একটু কি মেন চিন্তা করল, তারপর বললে, শুটাই আমার ফুল হয়ে
গিয়েছিল। বলে হাসল। বললে, কত ডাক্তারকে তো জিনিয়াস মনে হত, কি
রমরমা প্র্যাকটিস, কিন্তু যেই রিটায়ার করল, দু'বছর পরে দেখি আর রুগী আসে
না। আমার এমনিতও আসত না। এখনও আসে না।

হিরণ্য ভাবল একটু বেশি বিনয় দেখাচ্ছে। বললে, রুগী আসে না যদি তো
ধূনি জ্বালিয়ে বসে আছে কেন বাবা।

ছবি হেসে উঠল। বললে, আসে। দু'একটা আসে, এই আশপাশের। তবে
বেশির ভাগই প্যাডার চেনা লোক, ফী দেয় না।

হিরণ্য কিছু বলতে পারল না। রুগীদের খুলো-পড়া বসার ঘরখানা সেখ
বিশ্বাসও হ'ল।

বিষয় গলায় বললে, দ্যাখ ছবি, আমরা কিছু চিরকাল ডাক্তারদের গালগাল

দিয়ে এসেছি, টাকার কুমির বলেছি। জ্ঞানতাম না তোর মতও আছে।

হুশি হেসে উঠল। বললে, আমার মতই বেশি।... তোর মনে আছে ডাক্তারি পাশ করে কি আনন্দ? তোদের খাইয়েছিলাম, যেন বিশ্ব জয় করেছে। তারপর বাবার কাছে টাকা নিয়ে চেয়ার সাজালাম।

বিবর গলায় বললে, দুটো জিনিস চাই বুকলি। এক হাসপাতাল, আর দু'নম্বর হ'ল চেয়ার। আমার এই রোগাসোগা বেটে চেয়ার, লোকের বিশ্বাসই হয় না। টু বি এ শুভ ডক্টর, ইউ নীড টু হ্যাভ এ শুভ ফীজিক।

হিরণ্য হাসল। বললে, তা নয় রে, প্র্যাকটিস বাড়াতে হ'লে ভিড় বাড়তে হয়।

হুশি বুঝতে না পেরে বললে, মানে?

হিরণ্যের মনে পড়ে গেল।

বছর কয়েক আগের কথা, বীরেশ্বরবাবু তখন নানারকম খামেলা করছেন। কখনো কর্পোরেশন ট্যাক্স বেড়েছে, দিন টাকা, কখনো টিউবওয়েলে চাবি, কখনো জল আনতে গিয়ে সিঁড়িতে জল ফেলাছে বলে কথা শোনাচ্ছে।

তাই বিরক্ত হতে হতে হিরণ্য ভেবেছিল পি এক থেকে টাকা ভুলে একটা ফ্ল্যাট কিনেই ফেলবে। বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ঘোরাঘুরিও করেছে। যেখানেই যায়, প্রোমোটরের কাছে, সেখানেই ভিড়। আর ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। কারণ, এক একজনের সঙ্গে আধঘণ্টা ধরে তিনি কথা বলেন।

একদিন দেখে কি, পাঁচ ছ'জন লোক, বসে আছে। স্লিপ দেয়ার পর তারা ই যাচ্ছে আর আসছে। হিরণ্য গিয়ে কথাবার্তা বলে ক্রি়ে এল, তখনও তারা বসে আছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। কানে যেতেই বুকল, এরা সব প্রোমোটরেরই লোক। ভিড় বাড়ছে।

ফিরে এসে বলেছিল শুভাকে। —এও এক কাটা পোনার মোকান।

হুশিকেও সে-কথা বলল। হাসতে হাসতে বলল, প্রমেশনই বল, ব্যবসাই বল, সিক্রেট হল ঐ ভিড়। সিনেমায় দেখিস না ভিড় দেখলে তবুই ভিড় হয়। বাজারে যার কাছে কাটা পোনা কিনি, সে মাছের ঝাঁপ ছাড়িয়ে গাঁস করে খেয় যত্ন করে। ঐ বাড়তি খাটনি কেন জানিস? অন্যদের দাঁড় করিয়ে ভিড় বাড়াবার জন্যে। বেস্ট-সেলারের লিস্টে নাম ভুলতে পারলেই বইয়ের বিক্রি।

হুশি হো হো করে অট্টহাসে হেসে উঠল। বললে, ইন্স টু লোট, আগে জানলে ভাড়াটে রুগী বসিয়ে রাখতাম।

হিরণ্য সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল, নিজেও একটা ধবাল।

একটা সিগারেট বের করে নিয়ে ধবাল হুশি, খোঁয়া ছাড়ল, তারপর বলল, কি ব্যাপার বল। বোটা ভাল আছে তো? ছেলেমেয়েরা?

ছাড় নেড়ে হিরণ্য চুপ করে রইল। একটু পরে বললে, বলছি। আসলে এতক্ষণ ধরে ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল। সুযোগ খুঁজছিল কখন বলা যায়, কি ভাবে বলা যায়। ওর বাইরেটাই এতক্ষণ কথা বলছিল, হাসছিল, রসিকতা করছিল, বুকের ভেতরটা ছিল উদ্ভাস্ত।

একে একে সব বলে গেল হিরণ্য। বলতে বলতে ওর মুখেও ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল, গলা কেঁপে গেল।

অনুনের স্বরে বললে, হুশি, একটা উপায় বাতলে দে। আমরা কেউ রাতে ঘুমোতে পারছি না।

হুশি চুপ করে রইল। ওর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কি যেন ভাবছে, কি যেন ভাবছে।

হিরণ্য অপেক্ষা করল। —কি রে কি এত ভাবছিস? একটা কিছু বল। ভদ্রায়তা ভেঙে যেতেই হুশি বলল, নাঃ, কিছু না।

একটু ধেমো বললে, হিরণ, আমি তো শুধুই জি পি, আমি কি করবো? তারপর একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে একটা নাম আর ঠিকানা লিখে দিল। —গিয়ে দেখা কর, মাথ কি করতে পারে।

—তুই একটা চিঠি দিবি না?

—হুশি বললে, যা না, আমি ফোন করে দেব।

একটু চুপ করে থেকে বললে, আজকাল তো অনেক সরকারী ক্লিনিকও হয়েছে। ইন্স নাথিং ইম্প্রিয়াল, সোজা চলে গেলেও তো পারিস।

ঠিকানাটা দেখিয়ে হিরণ্য বললে, ইনি কি গায়নোকলজিস্ট?

—ই।

তারপর স্নান হেসে বললে, আমি এর মধ্যে থাকতে চাই না হিরণ। ডুল বুকিস না আমাকে। আয়াম ভেরি আনলাকি।

একটু চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ বললে, তখন জিগ্যোস করলি কি এত ভাবছি? সত্যি ভাবছিলাম।

একে একে বলে গেল হুশি।

ফেন্নার পথে সেই কথাগুলোই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। ও যেন প্রতিটি দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। দেখতে দেখতে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল হিরণ্য। ভীষণ, ভীষণ ভয়।

বেচারা ছবি। কত আশা নিয়ে শুরু করেছিল জীবন। কিছুই হ'ল না।
 চেয়ারে শুধু বসে থাকে, যদি কোন রঙ্গী এসে পড়ে যেন ফিরে না যায়।
 শোফার কুশনে শুধু ধুলো, কার্পেটে পানের পিক, ওয়ালপেপার মলিন।
 ধরখানাই যেন একটা ব্যর্থ বিষয় মানুষের প্রতিজ্ঞা। অথচ এত এত টাকা খরচ
 করে ডাক্তারি পড়া। কি অপরিণীম পরিশ্রম, কি বৈর্থ। সব ব্যর্থ।

নাকি এই ঘটনাগুলোই শুকে ভেঙে দিয়েছে।

হ্যাঁ, আরেকটা ঘটনার কথাও মনে পড়ে গেল। ছবিই বলেছিল একদিন।
 তখন মাঝে মাঝে দেখা হত।

বিকাশ, ছবি, হিরণ্ময় সিনজুনই বিভিন্ন দিকে ছিটকে গেছে। বিয়ে-থা করে
 সবাই সসারী। ছেলেমেয়ে নিয়ে সবাই নাস্তানাবুদ।

কিন্তু রবিবারের আড্ডাটা ঠিকই ছিল। সকলেই দূরে দূরে, তখন অবশ্য দূর
 মনে হত না। বাসে ট্রামে সে-সময় এমন ভিড়ভাট্টা ছিল না, সময় পাই না এমন
 অজুহাতও দিতে হত না, কারণ পুরোনো দিনের বন্ধুদের টান তখনও সজাগ।
 আড্ডা দিয়ে আনন্দ পাওয়া যেত।

রবিবারের সকালটা ছিল নিয়মের অঙ্গে বাঁধা।

সিনেমা হলের সামনে একটা চায়ের দোকানে বসে ওরা তিনবন্ধু কলেজের
 দিন থেকে আড্ডা দিয়ে আসছে ঐ দোকানে। মালিক চাটগায়ের লোক, ওদের
 খাতির করত খুব, মাঝে মাঝে গল্প জুড়ে দিত তার নিজস্ব ভাষায়।

সপ্তাহে একদিন, রবিবার সকালে, ওখানে আসা চাইই। নিত্যদিনের আড্ডা
 তখন সপ্তাহে একদিনে এসে ঠেকেছে। বাকি সময় নিয়ে নিয়েছে কারো চাকরি,
 কারো প্রেক্ষশন, কারো বা ব্যবসা। উদ্বৃত্ত সময়টুকু সংসারের।

হিরণ্ময়ের ধারণা ছিল ছবির প্র্যাকটিস খুব জমছে। বিকাশের ব্যস্তসকালেই
 বরং গণ্য করত না।

ঠাট্টা করে বলত, তোর আর কি ছবি, পাঁচ বছরে যা পিটিয়ে নির্বি সারা জীবন
 বসে যেতে পাবি।

হিরণ্ময়ের চাকরিটা ছিল খুবই ছোট বরের। ছবি তো ছাড়া ভাল ছিল,
 ডাক্তারি পাসও করে গেল। একদিকে ঈশং হীনমনাতা। অন্যদিকে গর্বও, ছবির
 জন্যে।

বড় সন্তান থাকে চায়ের দোকান। বসে বসে কতকাল, আরো কম বছরে কম
 খয়েসী মেয়েদের নিয়ে প্রেমে পড়া প্রেম-পড়া খেলা। পরস্পরের হেলেমানুষির
 কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে হাসছিল। আড্ডা জমে উঠেছিল।

হঠাৎ চেয়ার ঠেলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল ছবি, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে
 চলমান কারো দিকে ঠায় তাকিয়ে রইল। হয়তো কোন চেনা লোক।

কিন্তু কণ পয়ে ফিরে এসে বসল। চূপচাপ।

বিকাশ ঠাট্টা করে বলল, কি রে কোন প্রাক্তন প্রেমিকা? মানে যার পিছনে
 ছোট্টাট্টা করেছিলি?

হিরণ্ময় হেসে বলল, নাকি নতুন? এখনও ছুটিস?

বিকাশ আর হিরণ্ময় দু'জনই নিজেদের রাসিকতায় হাসল।

ছবি চূপচাপ। কি যেন ভাবছে।

তারপর বললে, একটা ছেলে চলে গেল, বাচ্চা ছেলে। বছর বারো।

ওর গলার স্বর গাড় হয়ে এল। —যেহে থাকলে জানিস, ছেলেটা ঠিক ওর
 বয়েসী হত। ঐ রকমই দেখতে।

হিরণ্ময় বুঝতে না পেরে বলল, কোন ছেলেটা? কার কথা বলছিস?

ছবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। —পাঁচ ছ' বছরের একটা বাচ্চা। পেটে ব্যাথা,
 তার মা নিয়ে এসেছিল। ট্যাবলেট দিয়েছিলাম।

পরের দিন এসে বললে, এলার্জি হচ্ছে। আরেক কোম্পানির একই ওষুধ
 লিখে দিলাম।

ছবি চূপ করে রইল।

—পরের দিন হস্তমস্ত হয়ে ডাকতে এল। গেলাম। মাইবি বাচ্চাটা মরে
 গেল।

বিষয় হাসি হাসল ছবি।

বললে, এখনো দেখতে পাই। মা-টা হাউ হাউ করে কাঁদছে, আর বাবা
 বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কাঁদায় ফেটে পড়ে চিকিৎকার
 করে উঠল, ইউ আর এ মার্ভারার।

একটু থেমে বললে, এখনও কানে শুনতে পাই।

এ-সব অনেককাল আগেকার কথা। মনে ছিল না, মনে পড়ে গেল।

ছবির ধুলোজমা চেয়ার থেকে যখন বেরিয়ে আসছে হিরণ্ময়, ছবি বললে,
 ওপরে ফাবি না?

—না রে, তাড়া আছে।

হিরণ্ময়ের পকেটে তখন ছবির দেয়া গায়নোকলজিস্টের ঠিকানা, বুকে জীত
 বিব্রাভ দুশ্চিন্তা। মেয়েটাকে নিয়ে কি করা যায়, যমুনাকে নিয়ে।

ছবি আরো দূর খরিয়ে দিয়েছে ওর জীবনের আরেকটা ঘটনার কথা বলে।

দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এল হুবি।

বললে, কিছু মনে করিস না। আয়্যাম ভেরি আনলাকি। বললাম তো তোকে সব। তাই এসবের মধ্যে থাকতে চাই না।

ওখান থেকে সটান আপিসে চলে গেল হিরণ্ময়। সেইটা করে নিয়ে যদি সুযোগ পায় একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বে।

আপিসে বসে থাকতে থাকতে বার বার অনামন হয় যাক্ছিল।

উমেশ এসে বললে, কি এত ভাবছেন কাল থেকে? বাড়িওয়ালাকে নিয়ে সেই পুরোনো প্রবলেম?

হিরণ্ময় বিষম হেসে বললে, না কিছু না।

সুধাকান্ত এক সময় এসে বলল, আপনি দিনকয়েক ছুটি নিয়ে নিন হিরণ্ময়দা।

হিরণ্ময় বিষম হেসে বললে, হু।

পাশের টেবিলের সুকুমার উঠে এসে বললে, দিন পনেরো বাইরে কোথাও ঘুরে আসুন তো। আপনার কি যেন হয়েছে।

হিরণ্ময় বিষম হেসে বললে, না না, আমি ঠিকই আছি।

আসলে হুবি ওর মনের মধ্যে একটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

হুবি যখন বলছিল, শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল নাগালের মধ্যে সমাধান পেয়ে যাচ্ছে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

এখন বুকে ভয়, আর দৃশ্যটা যেন পর পর দেখতে পাচ্ছে।

হুবি তখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, স্যারের প্রিয় পাঠ্র। গলায় স্টেথোস্কোপ কুলিয়ে সগর্বে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়ায়।

এক ফুলের বন্ধু এসে হাজির।

বললে, তোর সঙ্গে কথা আছে, খুব কনফিডেনসিয়াল। রাস্তায় চল।

দৃশ্যটা যেন দেখতে পাচ্ছে হিরণ্ময়।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটা বলছে, তুই একটা কিছু কর, তোর তো এং চেনাজানা। তা না হলে মেয়েটা সুইসাইড করতে বাধ্য হবে।

হুবি হাসতে হাসতে বলছে, অপরের ঘাড়ে কেন সোষ চাপাচ্ছিস, দাদী তো তুই নিজে। স্বীকার কর, তা হলে চেষ্টা করে দেখব। তোর জন্যে চেষ্টা করতে পারি, অপরের দায়ের সঙ্গে কেন নিজেকে জড়াতে যাব।

হিরণ্ময় দেখতে পাচ্ছে, ছেলেটা চুপ করে রয়েছে, চোখের দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। যেন দাঁড়াতে পারছে না, পড়ে যাবে।

মাথা নিচু করে বললে, হ্যাঁ। তারপর দু' চোখে জল নিয়ে হুবির দু' হাত

জড়িয়ে ধরছে ছেলেটা। কতই বা বয়েস। —একটা কিছু কর হুবি, তা না হলে আমাদের সুইসাইড করতে হবে।

হুবি হেসে বললে, বিয়ে করে ফেল, তা হলেই তো সমস্যা চুকতে যায়।

ছেলেটা মাথা নিচু করে বলছে, হয় না।

হুবি বুঝতে না পেরে বললে, কেন হবে না? করলেই, তো'ইয়।

ছেলেটা বলছে, আমারই প্রায় সমবয়সী, কিন্তু সম্পর্কটা...

একটু থেমে বললে, বুঝতে পারছিস না, হয় আমাদের সুইসাইড করতে হবে, বিয়ে করলে আমাদের বাবা-মারা সুইসাইড করবে।

সেই ঘটনার কথা বলতে বলতে হুবি বলেছিল, জানিস হিরণ্ময়, মেয়েটাকে আমি দেখিওনি, তবু তার চেহারাটা যেন দেখতে পেলাম। কেমন মনে হল এই লজ্জা থেকে ওকে বাঁচাতেই হবে। তখন তো এত ক্লিনিক হয়নি, আইন বদলায়নি—দিনকয়েক ঘোরাঘুরি করে ভাল মুড়ে স্যারকে একদিন ধরলাম। সব খুলে বললাম।

স্যার এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। —না না, ওসবের মধ্যে আমি নেই।

—কি বললাম জানিস হিরণ্ময়? বললাম, স্যার, সায়েনাইড জোগাড় করে ফেলেছে। কালই সকালে হয়তো কাগজে দেখবেন...

হুবি চলে আসছিল। স্যার ডাকলেন, শোনো, শোনো।

সেই ঘটনার কথা বলতে বলতে হুবি একেবারে চুপ করে গিয়েছিল।

হিরণ্ময় তখনো আশা দেখতে পাচ্ছে। ফুলের বন্ধুর জন্যে যদি ও এতখানি করতে পারে, কলেজের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর জন্যে এটুকু করবে না? তাছাড়া, এখন তো এত ক্লিনিক হয়েছে, আইনে নিষিদ্ধ নয়।

হুবি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, উনি শেষ অবধি একজনকে বলে দিলেন। বললেন যাও, গিয়ে ভর্তি করে দাও।

হুবি বিষম হেসে বললে, জানিস হিরণ্ময়, খুশি হয়ে চলে আসছি, হয়তো একটু বেশি খুশি হয়েছিলাম, স্যার টেবিলের ওপর মাথা নামিয়ে কি লিখতে লিখতে গভীর গলায় বললেন, হোপ ইউ আর নট দ্য কলম্‌প্রিট। কি লজ্জা, কি লজ্জা।

তখনো হিরণ্ময়ের মনে আশা, হুবি কিছু একটা ব্যবস্থা করবেই।

কিন্তু এর পর যে এই রকম একটা দৃশ্য আছে হিরণ্ময় বুঝতেই পারেনি।

এখনো দেখতে পাচ্ছে।

গলায় স্টেথোস্কোপ কুলিয়ে হুবি লম্বা করিডোর ধরে যাচ্ছে। বেড নম্বর

জানা।

ভর্তি করে দিয়ে এসে স্থলের বন্ধুতা আর দেখাই করেনি। সেজন্যে খানিকটা রাগ, তার ওপর। অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। আবার মনের গোপনে একটা অদম্য কৌতূহল মেয়েটিকে দেখার জন্যে। ভর্তি করার সময় ভাল করে দেখেওনি তাকে। ও ব্যস্ত ছিল, মনের মধ্যে উদ্বেগও। তখনও কানে বাজছে, হোপ ইউ আর নট দ্য কালপ্রিট। সেজন্যেই নিজেকে আড়ালে রেখে স্থলের বন্ধুটিকেই এগিয়ে দিয়েছিল।

সিস্টার বেড নম্বর বলে কেমন একটা চৌকির কোণে রহস্যের হাসি ঐক্রে মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল।

তারপর আর যায়নি হৃষি। যেতে, খোঁজ নিতে কেমন যেন লজ্জা করছিল। হিসেব করে দেখল, আজই, কিংবা কাল মেয়েটি চলে যাবে। এর পর আর মেয়েটিকে হয়তো কোনদিন দেখতেও পাবে না।

এক ঝলক যা দেখেছে, মনে হয়েছে বেশ সুন্দরী। হয়তো সুন্দরী। মেয়েটিকে একবার ভাল করে দেখার ভীষণ ইচ্ছে হল হৃষির। ঐ তো যাচ্ছে, গলায় স্টেথোস্কোপ। ঘাড় উচিয়ে ঘরের নম্বর দেখছে। বেড নম্বর তো জানা।

ভেতরে ঢুকে গেল হৃষি। বেড ফাঁকা। নম্বর ভুল দেখছে না তো? না, মিলিয়ে দেখল ঠিকই। তা হলে হয়তো সুস্থ হয়ে গেছে। অন্য কোথাও উঠে গেছে। চলে যায়নি তো?

এদিক ওদিক খানিকটা পায়চারি করল। সময় কাটিয়ে আবার এল। বেডের কাছাকাছি একজন সিস্টার চাট লিখছিল। হৃষি এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করছে, আচ্ছা এই বেডের পেশেন্ট? সিস্টার কেমন অবাক চোখে তাকাত্তে ওর দিকে। যেন বুঝতেই পারছে না। হৃষি নাম বলল।

সিস্টার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, সে তো মারা গেছে। কালই। বলেই কেমন অবাক দৃষ্টিতে কিংবা সন্দেহের দৃষ্টিতে হৃষির দিকে তাকাল। হৃষির মনে হল কেমন একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে।

সিস্টার বলছে, আপনি অফিসে গিয়ে খোঁজ নিন। হৃষির কানে কোন কথাই যাচ্ছে না। ও মৃত পায়ে এমনভাবে চলে এল, যেন অফিসের দিকেই যাচ্ছে।

আসলে হৃষি পালাচ্ছে, পালাচ্ছে। নিজের কাছ থেকে। বলতে বলতে হৃষি টেবিলে ছড়ানো দু' হাতের ওপর মাথা রেখেছিল। অনেকক্ষণ পরে যখন মাথা তুলল, হিরণ্ময়ের মনে হয়েছিল, ওর দু' চোখে জল।

বলেছিল, আমি খুব আনলাকি রে। কিন্তু হিরণ্ময়ের এখন মনে পড়ে যাচ্ছে হৃষির কাছে শোনা সেই কথাটা। সেই বাক্য ছেলের বাবা কান্নায় ফেটে পড়ে বলছে, ইউ আর এ মার্ভার। এই মৃত্যুটার জন্যেও কি ও নিজেকেই দায়ী করছে নাকি। কিন্তু মৃত্যুও হয়, এ-কথাটা হিরণ্ময়ের মনে একবারও আসেনি। সেই মুহুর্তে তো নয়ই।

শুধু জিগ্যাস করেছিল, তোর স্থলের বন্ধু, সেই ছেলের আর এসেছিল? হৃষি হেসে বলেছিল, কোনদিন না। আপিসে এসে সেই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে হিরণ্ময় ভাবছিল, মৃত্যুও হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা বড়ো ভয়ঙ্কর মনে হল।

হিরণ্ময় ভাবল, হৃষিও কি আমাকেই সন্দেহ করেছে? ঐ ছেলটাকে তো করেছিল। কেন অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্চিস, বল না তুই নিজেই দায়ী। হৃষির সার বলছেন, হোপ ইউ আর নট দ্য কালপ্রিট।

হিরণ্ময় কি করবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না। হৃষির দেওয়া নাম-ঠিকানাটা বুকের মধ্যে বচস্চ করছে।

হৃষি কোন চিঠি দেয়নি। হিরণ্ময়ের মনে হয়েছিল এড়িয়ে যাচ্ছে। একটা সবকারী ক্লিনিকের নাম, একজন ডাক্তারের নাম, একটা ঠিকানা। ওটুকুই এখন শেষ ভরসা। কিন্তু ভয়ও।

সিস্টারের কথাটা হিরণ্ময়ও যেন শুনতে পাচ্ছে। সে তো মারা গেছে, কালই।

মারা গেছে! ঐ একটা কথাই ওকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। মারা যায়, মারা যেতে পারে, ভাবেইনি হিরণ্ময়। এত সব বিজ্ঞাপন দেখে, আশেপাশে এত সব কথা শোনে, আজকের দিনে এরকম অবতন ঘটতে পারে কল্পনাও করেনি। হৃষি অবশ্য বলেছে অনেককাল আগেকার কথা, তখন ও গলায় স্টেথোস্কোপ কোলানো ছাত্র। এখন তো দিনকাল পাণ্টে গেছে, কত ওষুধপত্র বেরিয়েছে; কত উন্নতি হয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্রের।

শুধু কেমন একটা সন্দেহ জাগছিল। মারা তো যেতেও পারে।

ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠছিল হিরণ্য।

মৃত্যু। তা হলে তো ঘোর বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। সে আরো ভয়ঙ্কর। থানা-পুলিস, মামলা-মোকদ্দমা। হাতে হাতকড়া পড়বে নাকি।

কালো রঙের পুলিস ভ্যানটার ভেতরে বসে হিরণ্য যেন জাল-জানালায় নাকমুখ চেপে বাইরের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে চাইছে।

হুপি বলছিল, গিয়ে দেখা কর, আমি ফোন করে দেব।

এখনো, আজকের দিনেও, মৃত্যু হতে পারে কিনা জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল ওর। জিগ্যেস করতে পারেনি।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে মনে ঠিক করল, ও নিজে যাবে না। এ-সব ঝগড়া থেকে দূরে থাকাই ভাল। হুমির নাম লিখে দেবে, ঠিকানাটার উপ্টো দিকে। যমুনাকে দিয়ে দেবে। বলবে, যা গিয়ে দেখা কর, ডাক্তারবাবু কি বলেন দেখ।

যদি দরকার হয়, বলবে, পাড়ার ঐ যে কে তোর বন্ধু আছে তাকে নিয়ে-চলে যা।

অর্থাৎ যাকে নিয়ে সেই দিদির খোঁজে গিয়েছিল।

যদি মৃত্যু হয়, তখন আর কেউ ওর কথা বিশ্বাস করবে না। ওকেই কালপ্রিট ভাববে। কিংবা কে জানে, হয়তো বিষ্টুকে। সে তো আরো সাংঘাতিক। তার চেয়ে নিজেকে আড়ালে রাখাই ভাল।

কিন্তু এত সব কথা কি ও যমুনার মুখোমুখি হয়ে বলতে পারবে।

লজ্জায় আত্মগোপনিতো যমুনা তো ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। চোখের আড়ালে আড়ালে থাকছে। হিরণ্যও চায় না ওর সামনে যেতে। ও এখন আর যেন মানুষ নয়, একটা নোংরা ক্রেদান্ত পিণ্ড।

বেরোনের সময় সিঁড়ির বাকো সামনাসামনি পড়ে যেতেই কি অস্বস্তি, কি অস্বস্তি। একটা কথা বলতেও এখন আর ইচ্ছে হয় না। যমুনার সমস্ত শরীরটা যেন অশুচি হয়ে গেছে।

এসে বেল্ টিপল।

দরজা খুলে দিল শুভাই। এখন অন্নর যমুনা ছুটে এসে দরজা খোলে না।

ওর পিছনে পিছনে শুভাও এল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে।

হিরণ্য শুভার দিকে তাকাল। ওর দিদি কিংবা বাবা-মা এসেছিল এমন কোন খবর আছে কিনা জানবার স্নাতক চেপে।

আর শুভা সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় বলল, বলেছে।

একটু থেমে বলল, সেই বললি, কিন্তু এত দেরি করে। বোকা, বোকা।

হিরণ্য তখনো পোশাক ছাড়েনি।

ও বুঝতেই পারল না। সপ্রশ্ন চোখে তাকাল শুভার মুখের দিকে। শুভা আবার চাপা গলায় বলল, লছমন।

॥ পাঁচ ॥

দপ করে জ্বলে উঠল হিরণ্ময়।

অস্ফা একটা শত্রুকে যেন এতদিন হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। যদিও জানত না শত্রুটা কে তা জানতে পারলেও কি করার আছে।

খানিকটা স্বস্তিও পেল। সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনাও হল। কারণ একটা ক্ষীণ সন্দেহও তো হয়েছিল একবার, কিন্তু সম্পর্কে। নিজের কাছেই নিজে যেন ছোট হয়ে গেল ও। নিজের ছেলের ওপরেও কি ওর এইটুকু বিশ্বাস নেই। ছি ছি।

আচ্ছা, শুভার মনেও কি হিরণ্ময় সম্পর্কে এককম কোন কুৎসিত সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল? হিরণ্ময় তা জানে না। কিন্তু প্রথম দিন, না কি পরের দিন, ওর মনে হয়েছিল শুভা ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না। হয়তো নিজেরই মনের ভুল। কিন্তু মনে তো হয়েছিল, আর তার জন্যে ভেতরে ভেতরে ও প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি এই যা।

আসলে কেউই বোধহয় কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। জীবন যখন স্বাভাবিক ভাবে চলে তখন মানুষ নিজেকেও চিনতে পারে না। একটা কিছু ঘটে গেলেই, কোন বিপদের সামনে পড়ে গেলেই ভেতরের মানুষটা নখ আর দাঁত নিয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে।

শুভার কথায় ও তো কিছু সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়েছিল।

—জানো, সেদিন যমুনা যখন বললে এই বাড়িরই কেউ, আমার বুক ধড়ফড় করে উঠেছিল, মাথা ঘুরছিল। চোখে জল এসে গিয়েছিল আমার।

শুভার কথাগুলো মনে পড়ল।

শুভা বলেছিল, আমি আর ওকে কিছু জিগ্যেস করতে সাহস পাইনি। কি নাম বলে বসবে সেই ভয়ে।

তারপর হাসার ঢেঁটা করে বলেছিল, অনেক পরে মাথা ঠাণ্ডা করে ওকে জিগ্যেস করলাম। বললাম, কি বলছিস যমুনা, আমাদের বাড়ির কেউ? আমাদের বাড়ির?

ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, হঠাৎ আমি কি ভেবেছি তা বুঝতে পারল, সঙ্গে সঙ্গে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে, না না না, আমাদের বাড়ির কেউ নয়। তারপর বললে, নাম জিগ্যেস করো না, আমি বলতে পারব না, কিন্তু এই বাড়ির।

মেয়েটা কি বোকা। এই বাড়ি বললে যে কেউ বীহেবরবাবুর বাড়ির কথা ভাববে না, বাকি ফ্যাটিলোর কথা কেউ ভাববে না সে কারাগার নেই।

কিন্তু শুভার কথাগুলো মনে পড়তেই হিরণ্ময়ের মনে হল শুভা ওকেও সন্দেহ করেছিল। নাকি শুধুই কিছুকে? জানার উপায় নেই। যদি করেও থাকে অন্যায় করেনি। হিরণ্ময় শুভার কথায় আশ্বস্ত হয়েছিল, না না, ও বলেছে আমাদের ফ্যাটিলোর কেউ নয়। তা সত্ত্বেও ও উঠে গিয়ে পাশের ঘরে, যেখানে ডাইনিং টেবলে বসে কিছু আর ক্রমি পড়ছে, সেখানে চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিল কেন। কেন কিন্তু সঙ্গে অকারণ কথা বলার অঙ্কুশাতে বার কর তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

নিজের ছেলের ওপরই যেখানে আস্থা ছিল না, যে বিপর্যয়ের মুখে বাড়িয়ে নিজের স্বামীর ওপরই আস্থা রাখা যায় না, সেখানে হিরণ্ময় কি করে যমুনার ওপর বিশ্বাস রাখবে।

সেই সরল গ্রাম্য মুখ, পলিমাটি দিয়ে গড়া একটা নিষ্পাপ মেয়ে, মুখে লাজুক লাজুক ভাব, চোখে অবাক অবাক দৃষ্টি, সেই যমুনার চেহারাটা রাতরাতি বদলে গিয়েছিল। তার ওপর সামান্য মায়া মমতাও ছিল না। সে শুধু একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি হয়ে গিয়েছিল, যে যে-কোন মুহূর্তে একটা গোটা পরিবারকে পাকের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে।

ওর দিদি গঙ্গা যেন একটা বিভীষিকা।

সত্যি তার সঙ্গে যমুনার দেখা হয়নি, খোঁজাখুঁজি করে বার্থ হয়ে ফিরে এসেছে, বিশ্বাস করতে পারছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, সেই কনকনে চালাক-চতুর মেয়েটা শিখিয়ে পড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছে যমুনাকে। হয়তো বলেছে, এই তো সুযোগ, বাবুদের ভয় দেখিয়ে কবুদের কাছ থেকে সেটা টান্কা আদায় করে নিয়ে আয়।

কিন্তু বলেছে, দশটা টাকা মাইনে বাড়াতে বলেছিলাম, রাজি হয়নি। লীড়া, খুব যে ডল্ললোক হয়ে আছে, আমাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে আমাদের চাকর বানিয়ে রেখেছে; দেখি কি করে পাড়াপড়শীর সামনে ইচ্ছন্ত নিয়ে থাকে।

তখন চোখের সামনে একটা আতঙ্ক। তাই হিরণ্ময় মনে মনে একটা

প্রতিবাদের পথ ভেবে রেখেছিল।

যমুনার মা একবার দেখা করতে এসেছিল, বড় মেয়ে গঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে।

বলেছিল, মা, কিছু মনে করোনি, মেয়ে সখচ্ছর মুখ বুজে খাটতিছে, কোথাও তো যাবার নাই। রথের দিন গঙ্গা উকে মেলা দেখায় আনবে।

শুভা রাজি হয়ে ছুটি দিয়ে দিয়েছিল।

হিরণ্ময় বলেছিল, সত্যিই তো, কোথাও তো বেড়াতে যেতে পায় না, ওকে একটা দিন ছুটি দিয়ে দিয়ো।

খাওয়া-দাওয়ার পর গঙ্গা এসে ওকে নিয়ে গিয়েছিল।

শুভা যমুনার হাতে পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়েছিল। বলেছিল, যদি কাচের চুড়িচুড়ি কিনতে ইচ্ছে হয় কিনিস, কিছু খেতে ইচ্ছে হলে খাবি। টাকটা নিতেও কি অস্বস্তি যমুনার। কিছুতেই নিচ্ছিল না।

গঙ্গা হেসে বললে, নে না, বাবুলা দিচ্ছেন নিতে হয়।

ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময় বলেছিল, ঘুস?

শুভা রেসে গিয়েছিল, ঘুস আবার কিসের, রথের মেলায় যাবে...

হিরণ্ময় হেসে উঠে বলেছিল, দিতে তো আপত্তি করছি না, কিন্তু যতই ঘুস দাও, যখন যাবার তখন ঠিকই চলে যাবে, এ-সব কিছুই মনে রাখবে না।

যমুনা বলে গিয়েছিল, সজ্জার আগেই ফিরে আসবে, রাতের রান্না ও-ই করে দেবে।

কিন্তু সজ্জা হয়ে যেতেও যমুনা ফিরছিল না।

শুভা বার বার ঘড়ি দেখছিল। আর ক্রমশই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল। যমুনা ফিরছে না কেন, যমুনা ফিরছে না কেন।

শেষে এক সময় মুখ ফুটে বলেই ফেলল, আমার মনে হচ্ছে যমুনা বোধহয় ফিরবে না।

সে-রকম একটা আশঙ্কা তখন হিরণ্ময়েরও।

বললে, ওকে না ছেড়ে দিলেই হত। দিদিটা তো কম ধূর্ত নয়। এ-মাসের মাইনে তো ওর মা নিয়ে গেছে, রথের মেলায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে হয়তো ছাড়িয়ে নিয়ে গেল।

শুভা বললে, দশটা টাকা বাড়িয়ে দিলেই হত।

যখন ওরা ধার্য নিঃসন্দেহ যে যমুনা আর ফিরবে না, চালাকি করে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, সেই সময় হাসতে হাসতে ফিরল যমুনা।

ওরা তখন কি খুশি, কি খুশি।

খুশি যমুনাও। দু' হাতে কাচের চুড়ি, কানে দুটো নকল রূপোর কুমকো, কাগজে মোড়া কি-সব টুকটাকি। আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে শুতাকে দেখাচ্ছিল।

শুভা আদরের ভঙ্গিতে শুধু বললে, হ্যাঁ রে, এত রাত করে।

যমুনার মুখ থেকে আনন্দ উবে গেল। শুধু বললে, দিদিকে ভেঁ কতবার বললাম, শুনল না।

তারপর হেসে বললে, ভয়ে তো দিদি এলই না ওপর অবাকি, ষ্টার্টের কাছে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

সেদিনের কথাটা হিরণ্ময়ের স্পষ্ট মনে ছিল। আর শুতাকেই ভেবেছিল বাঁচবার উপায়।

যদি ঐ তুখোড় মেয়েটা, গঙ্গা এসে হঠাৎ হাজির হয়, জবাবদিহি চায়, তা হলে সেই দিনটাকেই টেনে আনবে।

বলবে, তুমিই তো ওকে নিয়ে গিয়েছিলে রথের দিন, অনেক রাতে ও ফিরে এল, একা-একা। আমরা কি করে জনব ও কোথায় গেছে, কি করেছে।

কিংবা গঙ্গাকে দায়ী করবে।—তুমি তো নিয়ে গিয়েছিলে, কি করেছে না করেছে তুমিই জানো। এখন ভালমানুষ সাজছে।

এই সব ভেবে রেখেছিল হিরণ্ময়। কিন্তু মনের ভয়-ভয় ভাবটা বোচাতে পারেনি। ওর নিজের ওপরই কোন আস্থা নেই।

গঙ্গা ওর কাছে এখন একটা আতঙ্ক। এসে হাজির হলে কোন কথাই বলতে পারবে না।

ওর বাবা-মা যদি আসে তা হলেই বা কি বলবে।

কিন্তু ও বাড়ি ফিরতেই শুভা বলে বসল, বলেছে।

একটু থেমে বললে, সেই বলালি, কিন্তু এত মেরি করে। বোকা, বোকা। ও বুঝতেই পারল না, সপ্রশ্ন চোখে তাকাল শুভার মুখের দিকে।

শুভা আবার চাপা গলায় বলল, লছমন।

বীরেশ্বরবাবুর পেয়ারের সেই ছোকরা চাকরটা।

দপ করে জ্বলে উঠল হিরণ্ময়। মূহুর্তের জন্যে মনে হল ও একটা বিরাট অপবাদ থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তুকে নিয়েও আর কোন দুর্ভাবনা নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিহারী চাকরটার ওপর প্রচণ্ড রেগে গেল।

এর চেয়ে বড় অপমান যেন নেই। সেই সরল নিষ্পাপ মেয়েটা, যার ওপর এত মায়া এত মমতা জন্মে গিয়েছিল, সে নিজে বিপদে পড়ে সারা পরিবারটাকে

বিশেষে কেলেছে বলে রাতরাতি একটা বাইরের অটোনে ঘরে হয়ে গিয়েছিল।

“ভাড়িয়ে দাও, ওকে এখনই ভাড়িয়ে দাও”, হিরণ্ময় বলেছিল।

কিন্তু লছমনের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময়ের মনে হল বিহারী চাকরটা যেন ওকেই অশ্রুমান করেছে, ওদের সকলকে।

বন্ধুনা তো ওদেরই কাজের মেয়ে। মেয়ের মত।

হিরণ্ময় আগিসের পোশাক ছাড়ল না।

বলল, আসছি।

শুভা উদ্বেগে স্বরে বললে, কোথায় যাচ্ছ আবার?

—আসছি। বলে বেরিয়ে গেল।

রাগ শুধু লছমনের বিরুদ্ধে নয়। বাড়িওয়ালা বীরেশ্বরবাবুর বিরুদ্ধেও।

গ্যেটের সামনে বিকাশ পাড়ি রেখেছিল বলে বীরেশ্বরবাবুর মন্তান ছেলোটো অভদ্রভাবে অপমান করেছিল। সে-কথা ভুলতে পারেনি হিরণ্ময়। লছমন হারামজাদাও কোড়ন কেটেছিল। চাকর চাকরের মত থাকবি, তা নয় সেও বাড়িওয়ালার হয়ে গিয়েছিল। আর বীরেশ্বরবাবু লোকটাও মোটেই সুবিধের নন। লাক্ষ্মীকে সর্ব সময়ে বুঝিয়ে দিতে চান উনি বাড়িওয়ালার। যেন গ্যেটের ভাড়াটেরা বিনা ভাড়ায় থাকে।

পাড়ার এগারো নম্বর বাড়ির সীতানাথবাবু ঠিকই বলেছিলেন, ছোটলোক, ছোটলোক। পি ডবলু ডির সামান্য চাকরি করে এই পেয়াল বাড়িখানা তুলেছেন।

হিরণ্ময় তখন নতুন এসেছে, বীরেশ্বরবাবুর মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে ভেবেছে রীতিমত ভদ্রলোক, ভালমানুষ। সীতানাথবাবুকেই ভেবেছে খরাপ, খরাপ। লোক চিনতে ভুল হয়েছিল। এখন তো দেখা যাচ্ছে সব দিক থেকে অসুবিধে সৃষ্টি করে তুলে দিচ্ছে। তুলে দিতে পারলেই বেশি ভাড়ার নতুন ভাড়াটে নিয়ে আসবে।

এতকাল টিউবওয়েলটা সারাদিনই খোলা থাকত, তালাচাবির কোন প্রসঙ্গই ছিল না। পাড়ার সকলেই জল নিত।

সীতানাথবাবু হেসে বলেছিলেন, তা নয় হিরণ্ময়বাবু, তা নয়। ও যে কি সালসা লোক আপনি জানেন না। ময়লা জল উঠত, জলে বাসি, মিস্ত্রিরা বলে গিয়েছিল যত জল উঠবে ততই পরে ভাল জল আসবে। সেজন্যেই ডেকে ডেকে সবাইকে জল নিতে বলত। এখন ভাল জল আসছে তাই তালাচাবি।

হিরণ্ময় সায় দিয়ে বলেছে, ভাড়াটেনের জল করছে।

সীতানাথবাবু ডরসা দিয়ে বলেছেন, আপনি ভাববেন না, আমর পাড়ার সকলে চোঁটা করছি, কপোরেশন যাতে এ-রাত্তর একটা টিউবওয়েল করে দেয় তার জন্যে পিটিশন করছি।

সাত নম্বরের যুগলবাবু যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে। বোধহয় কথটা কানে যেতেই থেমে পড়লেন। আমাদের পিটিশনে কি হবে মশাই, ঐ বস্তির লোকদের দিয়ে পিটিশন করান, সেখান থেকে রাতরাতি হয়ে যাবে। এখন তো ওদেরই জিনিস।

হিরণ্ময়ের সঙ্গে যুগলবাবুর আলাপ নেই, শুধু মুখচেনা। বর্মুনার আগে যে ছিল, পার্বতী, সে বলত সাত নম্বরের বাবু, সাত নম্বরের গিন্নি। ওদের কাছে সকলেই এক একটা নম্বর। বাড়ির নম্বরটাই পরিচয়। তিন নম্বরের সোতলার বাবু কিংবা ন নম্বরের তেতলার গিন্নি।

বড় বড় আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাট বাড়িগুলোয় তো ভদ্রলোকরাও এভাবে কথা বলে।

হিরণ্ময় একবার এক উকিলের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। নাম বলতে কেউই চিনতে পারল না। সকলেই বলে কত নম্বর।

আর যেই নম্বর বলা অমনি এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আসুন আসুন, আমার সামনের ফ্ল্যাটেই থাকেন।

ফেরার সময় এক বছুর সঙ্গে দেখা। সেও ফ্ল্যাট কিনেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, আর সেই সময়, খুব খোলামেলা, সাজপোশাকে ঘটা, দেখতে বেশ সুন্দরী বলা চলে, এক তরুণী নামল গাড়ি থেকে।

হিরণ্ময় হেসে বললে, কি রে সিনেমা স্টার নাকি?

বছুটি হেসে বললে, দূর, ও তো ডি-সেভেটিনের মেয়ে।

হিরণ্ময় হেসে ফেলে বলেছিল, জেলখানাতেই তো শুনেছি কয়েদিদের পরিচয় এক একটা নম্বর। এই সব বড়লোকদেরও তাই নাকি?

বছুটি এই রকম একটা প্রশ্ন ফ্ল্যাট করে ফেলেছে, তার জন্যে নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে পর্বিষ। সুতরাং এখন বিনয় দেখানোর কোন অসুবিধে নেই। তাই অসম্ভবের ডকিতে বললে, এও তো একরকম জেলখানা। শোলট্রির মুরগীদের ঘর দেখিসনি। বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসেছিল।

হিরণ্ময় হাসতে পারেনি। বছুটির সৌভাগ্যে ওর তখন রীতিমত ইর্বা। সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠেছে, ও এখনো একজন নিছক ভাড়াটে।

নিজেই যখনই ভাড়াটে ভাবে, তখন টিউবওয়েলের তালাচাবির কথা মনে পড়ে যায়।

সীতানাথবাবু রাস্তায় একটা নতুন টিউবওয়েল হওয়ার সম্ভাবনা জানাতেই মনটা খুশি হয়ে উঠেছিল। সাত নম্বরের যুগলবাবু সে স্বয়ংক্রিয় ভেঙে দিলেন। বস্তির ওরা পিটিশন না করলে নাকি হবে না, ওদেরই এখন দিনকাল।

সীতানাথবাবু হেসে বললেন, বস্তিতে কতগুলো ভোট বলুন। ওরা তো শুধু দেশে কোথায় কত ভোট।

সামান্য একটা টিউবওয়েল, ছ'খানা ফ্ল্যাটের লোক এক কলসী কি দু' কলসী জল নেবে, তাতে কি এমন অসুবিধে। স্রেফ অসুবিধে সৃষ্টি করা। কারণ, কর্পোরেশনের টিউবওয়েল সেই বড় রাস্তায়। এতখানি দূর থেকে এক কলসী জল ধয়ে আনতে রাজি হয় না কাজের লোকেরা। শুধু বয়ে আনা তো নয়, সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় তুলতে হবে।

সেজনেই ভেতরে ভেতরে বীরেশ্বরবাবুর ওপর, তার পেয়ারের চাকর লছমনের ওপর এত রাগ। এখন তো আরো। এই চাকরটারই নাম বলেছে যমুনা।

পারলে ওকে যেন খুন করত হিরণ্ময়।

'আসছি' বলে বেরিয়ে এল ও।

তিনতলায় নেমে এসে বীরেশ্বরবাবুর দরজায় বেল বাজাল।

পাছে বীরেশ্বরবাবুকে বাড়িওয়ালা না ভেবে কেউ ভাড়াটে ভেবে বসে, সেজনেই ওর দরজাটা অন্যরকম। সীজনড টীক, আর তার ওপর জোর পালিশ। পিতলের বকরকে নক্সা বসানো। ভাড়াটেশ্বর দরজার বাজে কাঠ ঢাকা দেওয়ার জন্যে সবুজ রঙ। দরজা জানালাতেও ওর দরজা জানালায় সব বকরকে পালিশ।

বেল বাজাতেই ওর ছোট মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

—বাবা আছে?

মেয়ে বলল, ঐ তো ব্যালকনিতে। চলে যান।

নিজেই এগিয়ে গিয়ে ডাকল, বাবা।

বীরেশ্বরবাবু মুখ তুলে ডাকতেই হিরণ্ময়কে দেখতে পেলেন।

মেয়ে চলে গেল।

ব্যালকনিটা শুধু তেতলায়। অর্থাৎ সবটাই প্রায় কাচের জানালা। খোলা ছিল বলে হু হু করে হাওয়া দিচ্ছিল। হিরণ্ময়ের ঘরে এতটুকু হাওয়া ঢোকে না, ওর তো দক্ষিণ চাপা।

বীরেশ্বরবাবু একটা নীল লুপ্তি পরে খালি গায়ে বসেছিলেন বেতের চেয়ারে।

সেখো হাসলেন। আসুন। খালি বেতের চেয়ারের দিকে আঙুল দেখালেন। হিরণ্ময় তখন রাগে কাঁপছে।

আসার সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে লছমনকে খুঁজছে। দেখতে পাননি। হয়তো বাজারটাজারে গেছে। দেখতে পেলে কি হত কে জানে। হয়তো ওর ওপর বাঁপিয়ে পড়ে চড়-ধুঁসি-লাথি মারতে শুরু করে দিত।

ভেতরে ভেতরে তখনো রাগে ফুসছে। ওরই তো চাকর। উনিই ফ্রেজ দারী। ভাড়াটে জম করার জন্যে এতকাল প্রস্রাব দিয়ে এসেছেন।

রাগে চেটে পড়ল হিরণ্ময়। বললে, আপনাদের ঐ চাকরটা, লছমন, জানেন ও কি করেছে?

বেশ যেন মজা পেয়েছেন বীরেশ্বরবাবু, এইভাবে হাসলেন।

সারা শরীর চিড়কিড় করে উঠল হিরণ্ময়ের।

বীরেশ্বরবাবু দু' হাতে লুপ্তিটা একটু টেনে তুলে এগিয়ে আনলেন মুখটা। বললেন, সব কানে আসে হিরণ্ময়বাবু, সব কানে আসে।

অবাক হয়ে তাকাল হিরণ্ময়। আশ্চর্য, ও ভেবেছিল গোপন রাখবে খবরটা। পাশাপাশি কোন ফ্ল্যাটের লোক ফেন জানতে না পারে। বিশেষ করে বীরেশ্বরবাবু। উনি তো ভাড়াটে তুলে দিতে চান, পারলে হিরণ্ময়কে উচ্ছেদ করে দেবেন। সেজনেই ভয় ছিল ব্যাপারটা জানতে পারলে না জানি কি পট্টা কষবেন।

যমুনার দিদি কিংবা বাবা এলে হয়তো হিরণ্ময়ের বিরুদ্ধে তাদের উদ্বেগজিত করবেন। কিংবা থানা পুলিশ, মামলা-মোকদ্দমা, কি হতে পারে তা তো জানা নেই। বস্তির লোকদের ডেকে এনে হল্লা। ভাবতেও আতঙ্ক।

কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা সব জানে। জেনেও চুপ করে আছে।

বীরেশ্বরবাবুই আবার বললেন, সব শুনেছি। আমার ড্রাইভারটার কাছে সব বলেছে।

হিরণ্ময় বললে, আর আপনি চুপ করে আছেন?

বীরেশ্বরবাবু হাসলেন। —আরে সে আর আছে নাকি, আমাদের কিছু না বলে সে ব্যাটা দেশে পালিয়েছে।

পালিয়েছে। চমকে উঠল হিরণ্ময়।

বীরেশ্বরবাবু বললেন, থাকলেই বা কি হত, আমাদের তো চুপ করেই থাকতে হত। আরে মশাই, এ সব ঝি-চাকরের নোংরা ব্যাপারের মধ্যে আমরা ভদ্রলোকেরা কেন মাথা গলাতে যাই। ওদের ব্যাপার ওরা বুঝুক।

একটু খেমে বললেন, তাড়িয়ে দিন মশাই; তাড়িয়ে দিন।

হিরণ্ময় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। প্রথম শুনেই ও রেগে গিয়ে, ভরে আঙুলে যে-কথাটা শুভাকে বলেছিল, বীরেশ্বরবাবুও ঠিক সে-কথাটাই বলছেন। তাড়িয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত।

হিরণ্ময় কিছু বলছে না দেখে বীরেশ্বরবাবু বললেন, দোষ তো মশাই এ মেরেটারই। আপনাদের কাজের মেয়ের।

—কি বলছেন? হিরণ্ময় বুঝতে পারল না।

বীরেশ্বরবাবু হাসলেন। —টিউবওয়েল তো আমি নটা থেকে দশটা খোলাই রাখতাম। আপনাদের ঐ যমুনা না কি নাম, এসে নাকি এক একদিন ইনি-বিনি-চাষি খুলে দিতে বলত। কাজ করতে করতে নাকি ভুলে গিয়েছিল।

হিরণ্ময় উত্তেজিত হয়ে বললে, তা কেন হবে, ও ব্যাটা কোন কোনদিন সাড়ে নটার বন্ধ করে দিত।

—তা জানি না, আমি যা শুনেছি তাই বলছি।

একটু খেমে বললেন, ও তো বিকেলে, সন্ধ্যার পরও চাষি খুলিয়েছে।

হিরণ্ময় চুপ করে রইল। রেগে গিয়ে প্রতিবাদ করতে এসে এখন এ কি নতুন কামেলা। লোকটা তো এখন হিরণ্ময়দেরই দায়ী করছে। যেন টিউবওয়েলে জল আনতে পাঠানোটাই দোষ।

বীরেশ্বরবাবু আবার হাসলেন, লছমনকে আমি তো একদিন ধরেছিলাম, রাত আটটার সময় ইটাং ইটাং শব্দ। লছমন বললে, আপনাদের যমুনা কান্নাকাটি করছিল, জল ফুরিয়ে গেছে, আপনারা নাকি বকাবকি করবেন।

হিরণ্ময়ের তখন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। উনি যা বলছেন সেগুলো সত্যি না মিথ্যে তাও জানে না হিরণ্ময়। শুভা হয়তো বলতে পারবে।

বীরেশ্বরবাবু বললেন, আরে মশাই এ তো বিশ্বনীতি। সব জায়গায় এই এক নিয়ম। যার যা পুঁজি সে তা ভাঙাবেই। মাড়োয়ারীদের হাতে টাকা আছে ওরা টাকা দিয়ে কেনে, চাকরিতে যার হাতে পাওয়ার...কত কনস্টবল ফুটপাথ থেকে ভিখিরি মেয়ে তুলে নিয়ে যায়, লছমনের হাতে টিউবওয়েলের চাবি ছিল, সেই বা কম যাবে কেন।

হাসতে হাসতে বললেন, যার যা পুঁজি। আপনার ঐ যমুনা মেরেটারও ছিল, তা নইলে টিউবওয়েলের চাবি খোলাত কি করে। বাড়ির মালিক বলে দিয়েছে, তবু তার কথা না মেনে...

হিরণ্ময় কোন কথাই বলতে পারল না। এ লোকটাকে কি বলবে। যমুনা, একটম সরল গ্রাম্য মেয়ে, বড় বড় অবাক চোখ, লাজুক লাজুক মুখ, পলিমাটির মত গায়ের রঙ, পলিমাটি দিয়ে গড়া একটা নিষ্পাপ মূর্তি। তার জন্যে এতটুকু মায়ী মমতা নেই। হাসছে। কি আশ্চর্য।

হিরণ্ময় উঠতে যাচ্ছিল। আর বসে থাকার কোন অর্থ নেই।

বীরেশ্বরবাবু বললেন, বসুন, চা খাবেন।

—না।

বীরেশ্বরবাবু হাতের ইশারায় বসতে বললেন।

কঠোর চাপা। —আপনি ভদ্রলোক, আমিও ভদ্রলোক। কার চাকর কার রি ওসব ভেবে লাভ নেই, বুঝলেন। আপনার বদনাম হলে আমার গারেও ছিটে লাগবে, আমার বদনাম হ'লে আপনারও। বস্তির লোকরা, কাজের মেয়েরা এ বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে ঐ ভদ্রলোকরা...

একটু খেমে বললেন, তাড়িয়ে দিন ও বেটিকে, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে তাড়িয়ে দিন। ওর বিশদ ও বুক।

একটু খেমে বললেন, যদি বললেন, আমিও দু'একশো দিয়ে দিচ্ছি।

হিরণ্ময় উঠে চলে এল।

মাথার মধ্যে তখনো কথাগুলো ঘুরছে। বীরেশ্বরবাবু মানুষটাকে তত খারাপ তো মনে হচ্ছে না। উনি তো কই বাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালা ভাব করলেন না। এতদিন তো ভেবে এসেছে বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটে দুটো পৃথক শ্রেণী, একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোন মিল নেই। একজনের সঙ্গে আরেকজনের স্বার্থের ঝগড়া। কিন্তু বীরেশ্বরবাবু তো অন্য কথা বলছেন। দু'জনের স্বার্থই এক। আমরা দু'জনই ভদ্রলোক। ঐ মানুষগুলোর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

ফিরে চলে এল হিরণ্ময়।

সঙ্গে সঙ্গে শুভা বলে উঠল, তুমি আমাকে কিছু না বলে ঐ লোকটার কাছে গিয়েছিলে?

কথার জবাব না দিয়ে হিরণ্ময় ধসে পড়া মানুষের গলায় বললে, লছমন তো পালিয়েছে। দেশে চলে গেছে।

শুভা ঝাঁঝের স্বরে বললে, সে তো আমি জানি।

—জানতে?

—তুমি তো বলতেও দিলে না, কিছু না শুনে চলে গেলে।

হিরণ্ময় পোশাক বদলাচ্ছে তখন। আপিস থেকে ফিরে আস্ত সব পোশাক সময় ছিল না, মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল রাগে। সেজন্যেই পোশাক না ছেড়েই চলে গিয়েছিল।

শুভা বললে, আমি তো তাবলাম তুমি সিগারেট আনতে ভুলে গেছ, তাই বেরিয়ে গেলে। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, ও ফ্ল্যাটের মিনু ফিরল তখনই, ও বললে, তুমি নাকি বাড়িওয়ালার সঙ্গে গল্প করছ ব্যালকনিতে বসে।

হিরণ্ময় চূপ করেই রইল। বীরেশ্বরবাবুর কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছে। শুভা দাঁড়িয়ে রইল। শেষে বসল খাটের এক পাশে। বললে, সেই বললি, কিন্তু এত দেরি করে, বোকা বোকা।

হিরণ্ময় চটে গিয়ে বলল, ঐ মুখ মেয়েটা লহমনের নামটা বলছিল না কেন? চোপে রেখেছিল কেন?

শুভা হাসার চেষ্টা করল। —সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি না শুনেই চলে গেলে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, বোকা আর কাকে বলে। লহমন এক নম্বরের ধূর্ত, কাউকে বলতে বারণ করেছিল, বলেছিল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। ও তাই বিশ্বাস করেছে।

—তারপর? হিরণ্ময়ের চোখে তখন প্রশ্ন।

শুভা বললে, আজ সকালে টিউবওয়েল থেকে জল আনতে গিয়ে জেনেছে লহমন নেই। ওদের ড্রাইভারটা নাকি বলেছে, সে দেশে পালিয়েছে।

হিরণ্ময় বললে, হ্যাঁ, বীরেশ্বরবাবুও বললেন। উনি তো সবই জানেন, সবই শুনেছেন ড্রাইভারটার কাছে।

শুভা বলে উঠল, শুনে আর তুমি ওকে বিশ্বাস করলে? বুঝতে পারছ না, কামেলার ভয়ে বাড়িওয়ালাই ওকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে?

কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে শুভা আবার বললে, তুমি ওই লোকটার কাছ গেলে কেন! পাজি, পাজি, এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন ভাজা মাছ উন্টে খেতে জানে না।

কামেলার ভয়ে বাড়িওয়ালাই ওকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এদিকটা একবারও মনে হয়নি হিরণ্ময়ের। বীরেশ্বরবাবু যা বলেছেন বিশ্বাস করেছে। ভাবতেই পারেনি উনিই লহমনকে সরিয়ে দিয়েছেন। এখন শুভার কথাটাই বিশ্বাস হচ্ছে।

হিরণ্ময় হতভাগার গলায় বললে, যমুনাই বা ওকে বিশ্বাস করল কেন। আগে

বললে তো...

আগে বললে কি লাভ হত কিছুই জানে না হিরণ্ময়, শুধু মনে হ'ল কিছু একটা উপায় হ'ত।

শুভা চূপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বললে, বিশ্বাস আর করেছে কোথায়। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে বলে রোজ ঘোরাচ্ছিল, সেজন্যেই তো লোকের আমার কাছে কেঁদে পড়েছিল। দিদির খোঁজে গিয়েছিল। বিশ্বাস করেনি বলেই তো।

তবু লহমনকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে যমুনা। কিছুতেই তার নামটা বলেনি। হয়তো ক্ষীণ আশা ছিল লহমন কিছু একটা উপায় করে দেবে। কিংবা লজ্জায় ওর নামটা বলতে পারেনি।

শুভা বললে, তবু ভাল যে বিয়ে করবে বলে নিয়ে ভেগে যায়নি।

হিরণ্ময় বললে, তা হ'লেও তো একটা সুরাহা হ'ত।

একটু গলা নামিয়ে বললে, আমাদের বাড়ি থেকে তো বিদেশ হ'ত।

শুভার গলার স্বর হঠাৎ গাঢ় হয়ে গেল। —তুমি শুধু ওকে বিদেশ করার কথাটাই ভাবছো। ওর কথাটা একবারও ভাবছো না। ... ওর সঙ্গে চলে গেলে কি হ'ত শেষ অবধি? ওর তো আরো সর্বনাশ করে ছেড়ে দিত, সারাটা জীবন। কোন পাড়ায় গিয়ে উঠতে হ'ত কে জানে।

হিরণ্ময় ক্লক গলায় বললে, ওর পাপের ফল ও ভোগ করত। এখন তো আমাদের ভোগাচ্ছে।

আসলে যমুনার ওপর শুভার এই দরদ হিরণ্ময় কিছুতেই বুঝতে পারছে না। মুখের কথায় মায়ামমতা দেখানোও যেন অন্যায়।

হিরণ্ময় এখন নিজে বাঁচতে চাইছে, নিজেদের বাঁচাতে চাইছে। এখন আর অন্যের কথা ভাবার সময় নেই। ও এখন বিভ্রান্ত। কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ভেবেছিল, হাবির দেয়া ঠিকানাটা একটা পরিব্রাজকের উপায়। কিন্তু হাবি তো ওকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। মারাও যায়। কি ভয়ঙ্কর কথা।

সেই দৃশ্যটা যেন দেখতে পাচ্ছে হিরণ্ময়। 'সে তো মারা গেছে।' ব'লেই সিসটার জুজু চোখে তাকাচ্ছে হাবির দিকে, যেন মেয়েটির মৃত্যুর জন্যে হাবিই দায়ী।

হাবি কেমন বিমর্ষভাবে বলছিল, নাস্টা মাইরি আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইল, যেন মেয়েটার ঐ অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। সে চাউনিটা মি, বিশ্বাস কর হিরণ্ময়, চোখ বুজলেই আজও দেখতে পাই।

বিষম হাসি ছেঁসে বলেছিল, অথচ মেয়েটাকে আমি ভাল করে দেখিইনি।

তারপর স্বগতোক্তি মত যেন নিজের মনকেই বোকাছিল। —আমি তো মেয়েটাকে লজ্জা থেকে বাঁচাতেই চেয়েছিলাম।

হিরণ্ময়ও তো যমুনাকে বাঁচাতে চেয়েছে বলেই হৃদয়ের কাছে ছুটে গিয়েছিল। পরকেটে একটা ঠিকানা আর বৃকের মধ্যে আতঙ্ক নিয়ে ফিরে এসেছে।

এদিকে বীরেশ্বরবাবুও সব জেনে গেছেন। এমন ভাবে কথাগুলো বললেন, যেন হিরণ্ময়ই দ্বারী। যেন টিউবওয়েল থেকে এক কলসী জল পাবার লোভে ওরাই মেয়েটাকে এগিয়ে দিয়েছে, মেয়েটার সর্বনাশ করেছে।

শালা! চাপা ক্রোধ থেকে মুখ থেকে কথাটা ছিটকে বেরিয়ে এল। বীরেশ্বরবাবুর উদ্দেশ্যে। একবারও লোকটার মনে হচ্ছে না, শেকল দিয়ে বাঁধা টিউবওয়েলের চাবিটা লছমেনের হাতে তুলে না দিলে মেয়েটার আজ এই দশা হত না। কি দরকার ছিল টিউবওয়েলে চাবি লাগানোর। প্রচুর আছে, তবু অভাব সৃষ্টি করে। অন্যদের কষ্ট দাও, তবেই জে সুখ। সর্বক্ষেত্রেই তাই। যাদের আছে তারা বোধহয় এইরকমই ভাবে। অভাব ছড়িয়ে দাও, অভাব অনটন, সমাজটাকে দুমড়ে মুচড়ে ছারখার করে দাও। সবাই যমুনা হয়ে যাক। তারা থেকে পড়ে যাওয়া একটা খোঁড়া বাগের শেষ আশ্রয়টুকুও কেড়ে নাও। একটা কৌনরকমে টিকে থাকা সংসারকেও নষ্ট করে দাও।

একটা দ্বিধা আর হৃদয়ের মধ্যে ছটফট করছে হিরণ্ময়। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। এর মধ্যে আবার শুভা যমুনার ওপর দরদ দেখাচ্ছে।

—এ কদিনও মুখে কিছু জোলেনি। ওর দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না, শুধু যন্ত্রের মত মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে। আর কাঁদছে।

শুভা বললে।

—কি বলছিল জানো? শুভার চোখও যেন ছলছল করে উঠল। —পা জড়িয়ে ঘরে কীদতে কীদতে বললে, মা, আমাকে বিষ দিলেও যে আমি মরতে পারব না। আমি মরে গেলে আমার খোঁড়া বাগটাও না খেয়ে মরবে।

কথাটা শুনে হিরণ্ময়ের বৃকের মধ্যে যেন একটা মোচড় দিল। অবাক হয়ে পেল ও কথাটা শুনে। ভাবতেই পারেনি। এই রকম একটা বিপদের সময়েও যমুনা কিনা তার নিজের বিপদের কথাই ভাবছে না। দুঃখ পাচ্ছে তার বাবা-মার জন্যে। তার খোঁড়া বাগটার জন্যে।

ওর বাবার কথাটা মনে পড়ল। দরজার কাছে লেগে দাঁড়িয়ে বলছে, আপনাদের কাছে দিয়ে গেলাম গো বাবু, বাকি এখন আমার কপাল। যেটা তো নেই, হুই বেটি, গলা আর যমুনা, ওরাই একজন এখন আমার পাক্তা ভাত,

একজন নুন-লব্ধা। ফোটানো ভাত ত্রো আর ভগমান দিলে না।

সে-সব কথা ভাবলে হিরণ্ময়েরও বৃকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। দয়া দেখাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পরমুহুর্তেই সাবধান হয়ে যায়। এই সব মিথ্যা মায়ামমতার জন্যে এতখানি ঝুঁকি নেওয়া চলে না। বীরেশ্বরবাবু ঠিকই বলেছেন। আপনি আমি ভয়লোক। সত্যি তো, ওদের সঙ্গে নিজেদের জুড়িয়ে ফেলা আমাদের শোভা পায় না। ওদের সমস্যা ওরা বুকুক। আমরা ভয়লোকরা কেন ওর মধ্যে নাক ঢেকাতে যাই।

হাবি বলছিল, স্যার কিন্তু কোনদিন আমাকে কিছু জিগেস করেননি। কি ভয়ে ভয়ে থাকতাম। মৃত্যুর খবরটা শুনেছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু না, একদিনও কিছু বলেননি। অথচ আমার কানে বাজত। হোপ ইউ আর নট দ্য কালজিষ্ট।

না, যমুনাকে নিয়ে যেতে পারবে না হিরণ্ময়। শুভাকেও যেতে দেবে না যমুনার সঙ্গে।

শুভাকে বোঝাতে গিয়েছিল, শুভা বুঝতে পারেনি। বুঝতে চায়নি।

বলেছিল, ওকে ডেকে দিচ্ছি, তুমিই বুঝিয়ে দাও।

পরের দিন সকালে, শুভা গিয়ে ডাকল। —আয় যমুনা, বাবু ডাকছে।

হিরণ্ময়ের তখন ভীষণ অস্থিতি। ওর সঙ্গে সামান্যামনি কথা বলতে হবে বলে। এতদিন যমুনাও সামনে আসেনি। এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে, হিরণ্ময়ও ওর দিকে তাকাতে পারেনি। আভাসে যখনই বুঝেছে যমুনা কোথাও বসে আছে দু'হাঁটুর মাঝখানে মুখ লুকিয়ে, কিংবা সংসারের কোন কাজ করে চলেছে যন্ত্রের মত, প্রয়োজন থাকলেও তখন আর হিরণ্ময় সেদিকে যায়নি। যেন লজ্জা যমুনার নয়, লজ্জা হিরণ্ময়েরই।

শুভা যমুনাকে ডাক দিতেই হিরণ্ময়ের অস্থিতি হল।

যমুনা এল না।

দু'তিনবার ডাকার পরও সে এল না দেখে শুভা রেগে গিয়ে ডেকে আমতে গেল।

নিজের ঘরে চূপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ও শুনেতে পেল শুভা বলছে, চল চল ওঠ, একজন ডাক্তারের ঠিকানা দেবে তুই সেখানে চলে যা।

হিরণ্ময় স্পষ্ট বুঝতে পারল যমুনা উঠছে না। বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছে, কিংবা ভয়। ছবিটা যেন দেখতে পেল। বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে, ক্রোধে সজোড় লজ্জা ভয়।

শুভা হঠাৎ এটা ধমক দিয়ে উঠল। —ওঠ বলছি, যেখানে যেতে বলছে,

যা।

মনে হ'ল হাত ধরে টেনে তুলল যমুনাকে।

একটু পরে ধীর স্থির পায়ে এগিয়ে এল, শুভার পিছনে পিছনে নিজের শরীর আড়াল করে, মুখ চোখ আড়াল করে। এক লহমায় যেটুকু দেখতে পেল, মাথা নিচু করে আছে।

হিরণ্ময়ও চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতে পারছিল না।

অস্বস্তি। ভয়ও। ওই সরল গ্রাম্য মেয়েটার সঙ্গে চোখোচোখি হ'লেই হয়তো হিরণ্ময়ের মায়া হবে। ও নিজেকে যত ভেতরে ভেতরে নির্মম আর কঠোর করে রেখেছে, মুহূর্তের মধ্যে সেই ছদ্মবেশ থেকে নরম সহৃদয় কোমল মানুষটা বেরিয়ে পড়বে। তখন হয়তো ও নিজের যমুনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবে। একটা অকারণ ঝুঁকি নিয়ে বসবে। একটা প্রকাণ্ড তুল করবে।

শুভার পিছনে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল যমুনা। এক লহমায় দেখা, তবু মনে হ'ল ওর টেঁট কাঁপছে ধরধর করে, সারা শরীর।

শুভা হঠাৎ সরে গেল। —শোন। বাবু কি বলছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা আত্ননাদ কান্নায় মিলে মিশে বেরিয়ে এল। —বাবু!

আর কিছু বলতে পারল না। দুটো হাত ওর হাঁটুর দিকে বাড়াল, মুখ তুলে জলে ভাসা দুটো চোখ তুলে হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে...

হিরণ্ময়ের ভয় হ'ল ওর চোখেও না জল এসে যায়।

ও এতদিন যমুনার দিকে তাকাতো ভয় পেয়েছে, ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। কি আশ্চর্য, এই মেয়েটাকে সম্মুখ করেছিল, দিদির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে হয়তো ওদের বিপদে ফেলতে চায়।

ওর 'বাবু' আত্ননাদ, ওর কান্না দেখে মনে হল এখনই পড়ে যাবে, অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

দু'হাত বাড়িয়ে ওর হাত দুটো ধরল হিরণ্ময়। —ওঠ, কোন ভয় নেই।

শুভা বললে, ঠিকানাটা দাও ওকে।

দিল।

হিরণ্ময় বললে, এই যে উল্টো দিকে নামটা, বলবি ওর কাছ থেকে আসছি।

অর্থাৎ স্থবির নাম।

তারপর বললে, এ পিঠে ডাক্তারের ঠিকানা।

শুভা বললে, তুই তো রাস্তাঘাট ভাল চিনিস না, পাড়ার সেই বড়টাকে নিয়েই যাস। ডাক্তারকে সব খুলে বলবি, কিছু লুকোস না।

হাত পেতে কাগজখানা নিল যমুনা। মাথা নিচু করে চলে গেল।

শুভা পিছন পিছন বলতে বলতে যাচ্ছে, কিছু টাকা দিয়ে দেব নিয়ে যাস যদি লাগে।

আর হিরণ্ময় নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করল। মনে মনে বললে, আমি কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই, রাজি নই।

॥ ছয় ॥

একটা জীবন, একটাই তো জীবন। দুঃখ এই, জীবনটাকে আর নতুন করে গড়ে তোলা যায় না।

যে কোন একটা ভুল যেন নদীর একটা বাঁক, তাকে আর আগের পথে নিয়ে যাওয়া যায় না। এই ভুলগুলো, হিসেবের এই গরমিল, মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

যমুনা একটা ভুল করে বসেছে। কিন্তু হিরণ্ময়ের নিজের জীবনটাও ভুলে ভরা। হয়তো অন্যরকমের, কিন্তু ভুলই তো।

ঠিকানা লেখা কাগজখানা যমুনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ও অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করল।

শুনতে পেল শুভা যমুনাকে বোঝাচ্ছে। গলার স্বর এখন আর চাপা নয়, কারণ কিছু আর রুমি কেউই বাড়িতে নেই। কিন্তু কলেজ কখন কে জানে, ও কিছু বেরিয়ে যায় অনেক আগেই। হিরণ্ময় হাসে, আপত্তি করে না। ও জানে এ বয়েসটা শুধু বন্ধুদের জন্যে। আজ্ঞার নেশা জীবনের আর সব নেশাকে ছাপিয়ে যায়। এমনকি প্রেমও তুচ্ছ এর কাছে।

হিরণ্ময়েরও এমন একটা বয়েস ছিল। ও জানে।

শুভা একদিন রাগারাগি করে বলেছিল, বাড়িতে তোর তো টিকিই দেখা যায় না। সকালে বেরিয়ে যাস, রাত করে বাড়ি ফিরিস। কাল থেকে টিকিন কেরিয়ারে সন্ধ্যা বেলাতেই তোর ভাত দিয়ে দেব। নিয়ে বেরিয়ে যাস।

রাগের স্বরে বলেছিল, ভাতটা তো আর বন্ধুরা বিনা পরামায় দেবে না। মার রাগ দেখে কিছু হাসছিল। রুমির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, মা আজ এত ফায়ার কেন রে।

হিরণ্ময়ও হেসে উঠেছিল।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ে গিয়েছিল, এ বয়েস ওরও একদিন ছিল।

বড় রাস্তার ধারে চায়ের দোকানটায় বসে ঘটীর পর ঘটী কেটে গেছে। ও,

হু, হুবি। আরো কেউ কেউ।

এখন ওয়া-কত স্বপ্নই না দেখত। এই পৃথিবীটা বললে যাবে, এই সেনটা ফলে ফলে। একটা সুখের ভবিষ্যৎ দেখতে পেত। সব মানুষ সুখী হয়ে গেছে।

কেন দুঃখ নেই।

দেখতে পাচ্ছে কিছুই বদলায়নি।

বদলায়নি বলেই তো শুধু একটা টিউবওয়েলের চাবি হাতে নিয়ে লহমণ

একটাও একটা গ্রাম্য মেয়েকে লোভ দেখাতে পারে।

সত্যি কি তাই? না, তাও নয়। আসলে শরীর বড়ো অবিশ্বাসী। আর যমুনার এই বয়েস হয়তো পৃথিবীটাকে বড়ো বেশি রঙিন দেখে। বড়ো বেশি বিশ্বাস করে।

হিরণ্ময় শুনতে পেল শুভা বলছে, এখানে কান্নাকাটি করে কি হবে, ডাক্তারের পা ড়িয়ে ধরে কাদবি।

রুমির আজ ছুটি, কাছেই এক বন্ধুর বাড়িতে গেছে। তাই শুভার গলার স্বর চাপা নয়।

হিরণ্ময় আপিস বেরোল বেশ নিশ্চিন্তভাবে। বুকের ওপর যে ভারী পাথরটা চাপা ছিল, সেটা সরিয়ে ফেলতে পেরেছে। সেটা এখন ভুলে দিয়েছে যমুনার কাছে।

হুবি নিশ্চয় ফোন করে দিয়েছে, নামটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

হুবি হাচ্চা লাগছিল নিজেকে।

এসে বললে, বাঃ, আপনাকে আজ তো বেশ ফ্রেশ লাগছে।

একসময় এসে বললে, অসুখবিসুখ নয় তা হলে, আপনি তো

বেশ ভাবিয়ে তুলেছিলেন হিরণ্ময়দা।

হিরণ্ময় হাসছিল। ও যেন মুক্তি পেয়ে গেছে। খুব খুশি খুশি। সেই কলেজে

না।

বিকাশ হেসে হেসে বলছিল, আমি? পরীক্ষার পরই একটা সুন্দর দেখে বড় জোঁগাড় করে নিয়ে ব্যবসায় বসে যাব।

ওর বাবার বেশ বড় ব্যবসা ছিল।

হিরণ্ময় বলেছিল, নিজে কিছু করবি না? বাবার ব্যবসায়?

তখন তো সামনে সব বড় বড় আদর্শ। নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়ানো। যেন পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করাটাও পাপ। নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ে নেব এই সব স্বপ্ন। সেজন্যেই বিকাশের কথাটা হিরণ্ময়ের খারাপ লেগেছিল।

বিকাশ হাসল। বললে, হ্যাঁ বাবার ব্যবসায়, কিন্তু বাবার মত ব্যবসায় নয়। আমি সেখিন একেবারে ভোল পাশ্ট সেব। একেবারে মডার্ন বিজনেস যাকে বলে। হাসতে হাসতে বলেছিল, বাবার সঙ্গে ফাইট তো তখনই জমবে। আমি একটা কিছু করে দেখাতে চাই, বুঝলি।

করে দেখাতে চাই।

হিরণ্ময় ওসব কিছুই ভাবেনি। ও শুধু ভেবেছিল পরীক্ষাটা ভাল করে পাস করতে পারলে একটা চাকরির চেষ্টা করবে। মনোমত একটা চাকরি পেয়ে গেলে নিশ্চিন্ত, আর তো জীবনের মত কোন চিন্তা নেই।

ভুল ভেবেছিল। যতই বয়েস বেড়েছে ততই দূরের দিকে তাকাতে শুরু করেছে, ততই ভয়। একটা নিরাপত্তার অভাব।

হিরণ্ময়ের এখনও নিজেকে শ্রোঁট মনে হয় না, বৃদ্ধ তো নয়ই। যেন সেই যৌবন বয়েসেই আছে। শুধু মিনিবাসের কন্ডাক্টর হঠাৎ 'দাদু' সম্বোধন করে মন বিবিধে দেয় কখনো কখনো। এখন আর গায়ে মাখে না, সস্ত্র হয়ে গেছে। কিন্তু বৃদ্ধ করে দিয়েছিল ঐ একটাই চিন্তা, রিটারায়মেন্ট। অথচ আগেকার কালে লোকে এই দিনটার স্বপ্ন দেখত, হাসতে হাসতে ভাবত, আঃ, এরপর অবসর ছায়া, গায়ে আর একটুও রোদ্দুর লাগবে না। সেকালে তো এমন হু হু করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ত না, স্বপ্নগুলো উড়ন্ত পায়রার মত নাগালের বাইরে চলে যেত না।

হিরণ্ময়ের এখনো অনেক কাজ বাকি, বেঁচে থাকা দরকার। বেঁচে থাকবেও ও, কই খাচ্ছে মৃত্যুর সামান্য ইশারাও তো দেখতে পাচ্ছে না। আর এত ভাড়াভাড়ি মৃত্যু এগিয়ে এলে ওর চলবেই বা কি করে।

চারভুলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কষ্ট হয়, গরমের দিনে তো অসহ্য গরম, ওপরে

আগ্নেয় তলা তুলেবে বলে বীরেশ্বরবাবু জলহান্ডাও করেননি। তাই এত গরম। ঠা হোক, তবু তো আশ্রয়। কিন্তু প্রতি মাসেই একটা আশঙ্কা, বাড়িওয়ালী না ভাড়া নিতে অস্বীকার করেন। একজন ভাড়াটের সঙ্গে কপড়া হবার পর তো ভাড়া নিচ্ছেন না। সে বেচারি ছুটে বেড়াচ্ছে রেন্ট কন্ট্রোলে। ভয়, কবে মাফলা করে বসেন উচ্ছেদের।

নিরাশ্রয়, নিরাশ্রয়। অথচ মধ্যবিত্তের সেই অহঙ্কারটুকু ঠিকই আছে। ভাড়া দিতে যাওয়ার সময় কি অস্বস্তি। বেন লোকটার কাছে হিরণ্ময় ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর হাতে হাতে রসিদটাও দেয় না। দিনের পর দিন তাগাদা দাঁও।

শেষ অবধি যমুনার হাত দিয়েই টাকাটা পাঠাত।

শুভা বলেছিল, ও খুব বিশ্বাসী। বাজারে কিছু আনতে দিলে একটা পয়সাও বেশি বলে না। আর খাওয়ার স্ক্রোম লোভ নেই। মীটসেফে তো কত কি থাকে, খীজে, আমি লক্ষ করে দেখেছি, অন্য কাজের মেরেগুলোর মত কিছু চুরি করে খায় না।

সেজন্যেই ওকে দিয়ে টাকাটা পাঠানো হ'ত। অস্বস্তি থেকে বাঁচবার জন্যে।

বীরেশ্বরবাবু একদিন নাকি ওকে বলেছিলেন, কেন রে, ভোর বাবু আসতে পারিল না?

ওনে চটে গিয়েছিল হিরণ্ময়। ও লোকটাও তো আমাদের মতই ছিল, বাড়ি করে একটু ওপরে উঠে গেছে। সেজন্যেই হয়তো অহঙ্কারে সুড়সুড়ি লাগে ভাড়াটে নিজে এসে ভাড়ার টাকাটা হাতে তুলে দিলে।

আমাদের, মধ্যবিত্তের, কিছু নেই। কিন্তু একটা জিনিস আছে, অহঙ্কার। যে নীচে পড়ে আছে তারও, যে একটু ওপরে উঠে গেছে তারও। আর ঐ 'অহঙ্কার' শব্দটাকে আমরা বোধহয় বদলে নিয়ে বলি 'আত্মসন্মান'। আর সেই আত্মসন্মান বজায় রাখতে সব সময়ে তটস্থ।

বাসের কন্ডাক্টর কিংবা ট্রান্সি-ড্রাইভার কিছু একটা বললেই সম্মানে লাগে। প্যাসেঞ্জার কিছু বললে তারও। আপিসে ওপরওয়ালী কিছু বললে নীচের লোকের, নীচের লোক কিছু বাকী কথা বললে ওপরওয়ালীর।

পাড়াপড়শী, আত্মীয়স্বজন সকলের কাছে আমরা শুধু আত্মসন্মান বজায় রাখতেই ব্যস্ত। কোন দুর্নাম না হয়, কোন অপবাদ না সুনতে হয়। সমাজ বোধহয় এভাবেই মানুষকে শাসন করে। তা না হলে যমুনাকে নিয়ে ডান্ডারের কাছে যেতে পারল না কেন হিরণ্ময়।

ছবি তো তাকে ফোন করে দিয়েছে।

একজন কলকাতার উত্তাপিঠে লেখা ছবির নামটা দেখালেই ডাক্তার নিশ্চয়ই
হিসাব করে দেন। কনুনা নিজেও ভো বলবে সব।

কনুনা বলে দিয়েছে, কিছু লুকোস না।

কনুনা গিয়ে বলেছিল, এখানে কেঁদে কি হবে, ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে
কাদবি।

কনুনা নিশ্চয় তার পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাদবে। বলবে, আমাকে
কিছু হাউ হাউ করব। ও সব কি আর শেখাতে হয় নাকি।

কনুনা বলল একটা মেয়ে, সেখানেও সূত্রী, বড় বড় চোখ, পলিমাটির মত রঙ,
পলিমাটি দিয়েই যেন গড়া একটা নিম্পাপ মূর্তি। ওকে দেখে ডাক্তারের নিশ্চয়
হাল হতে।

কিছু হিরণ্ময়ের কেন ওর জন্যে এখন আর কোন মায়ামমতা নেই ?
আম্মসহন ? দুনিয়ার ভয় ? নাকি আরো বড় একটা ভয় ওকে তাড়া করে
ঝেঁড়াচ্ছে।

মৃত্যুও হতে পারে।

ছবি বলেছিল।

বিবর মৃত্যু হাতড়াতে হাতড়াতে মাথা নিচু করে বলেছিল, গলায় স্টেথোস্কোপ
কলিয়ে কলিয়ে গেলাম। ওর বেড নম্বর জানতাম। ভীষণ লোভ হচ্ছিল মেয়েটিকে
একবার ঘেঁষি। জড়ি করতে যখন নিয়ে গেল, তখন ভাল করে দেখিনি, বন্ধুর
সামনে তাকে তাকিয়ে দেখতে লজ্জা করছিল।

কিছুক্ষণ চূপ করে ছিল ছবি। তারপর ধীরে ধীরে বললে, নার্সকে বললাম,
এই বেডের পেশেন্ট ? নাম বললাম। নার্স বললে, সে তো মারা গেছে। ব'লেই
কেনন রম্বাক হয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। আমি তার সেই চোখের
চাউনি সহ্য করতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম।

কনুনাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে হিরণ্ময়ের তো পালিয়ে আসারও পথ থাকবে
না।

মৃত্যুও হতে পারে। না, আজকাল বোধহয় হয় না। এখন তো চিকিৎসার
অনেক উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া আইনও শিথিল। অত ভয় পাবার বোধহয় কিছু
নেই।

মেয়ের মত। মেয়ের মতই এ-বাড়িতে থাকবে। শুভ সাধনা দিয়েছিল ওর
বাবা-মাকে। তারা থেকে পড়ে গিয়ে খোঁড়া হয়ে যাওয়া পা টেনে টেনে আসত
হাসুখটা। মাইনে নিয়ে যেত।

কিছুক্ষণ চার বছরের, সন্ধ্যা একটা কেজি ফুলে ঢুকেছে, শুভার তখন কতই
খা বয়েস। হিরণ্ময়ও বলতে খেলে মুবক।

শুভা ক্রমিকে ফুলে নিয়ে যেত, নিয়ে আসত।

একদিন বললে, জানো, ক্রমির পাশে যে মেয়েটা বসে, তার মা আমার খুব
বন্ধু হয়ে গেছে।

হিরণ্ময় হেসে বলেছিল, তাই নাকি ? এখন তো তোমার স্নানেক-বন্ধু, আমি
তো দেখেছি ফুলের সামনে রকে বসে সব খুব আড্ডা দাও।

—আজ্ঞা দিই ? একদিন গিয়ে বসে থাকো না অতক্ষণ। দেখবো কত ধৈর্য
পালক।

হিরণ্ময় রসিকতা করে বলেছে, ঐ যুবতী যুবতী বউগুলোর পাশে রাসে
অপেক্ষা করা ? খুব পারব, তুমিই সহ্য করতে পারবে না।

রাগমত গিয়েও হেসে ফেলেছে শুভা।

আর হিরণ্ময় বলেছে, গুরা জে দিবি আজ্ঞা দেয় দেখেছি।

তারপর হাসতে হাসতে বলেছে, আসলে ফুলটা তো ওদের ফাঁকিঝাড়ির
জায়গা। শাওড়ির খাড়ে সব কাজ চাপিয়ে দিয়ে বসে বসে আড্ডা মারে।

শুভা রেখে গেছে। —তুমি তো শোনোনি তাই বলছো। কি সব দজ্জাল
শাওড়ি আর নন্দ আছে, ওদের সব গল্প না শুনলে জানতে পারবে না। শুনে
নিউরে উঠতে হয়।

—তুমি কি ভাগ্যবতী, দুটোকে আগেই পার করে দিয়ে এসেছো। বলে হেসে
উঠেছে হিরণ্ময়।

তারপর বলেছে, ওটা তা হ'লে আসলে তোমাদের পরচর্চা ক্লাব।

—আহা তা কেন। একটা কাউকে তো ওরা দুঃখের কথা বলবে, তা না হলে
তো মরে যাবে।

একটু থেমে। — অনেক কিছু শেখাও যায়।

হিরণ্ময় আর কিছু বলেনি। কি শেখা যায় কে জানে।

শুভাই বলেছে, এই জানো, ক্রমির বন্ধুর মা বলল, একটু একটু করে সোনার
গুঁড়ো করিয়ে রাখতে। সেও নাকি করিয়ে রাখছে একটু একটু করে।

হিরণ্ময় অবাক হয়ে তাকাল শুভার দিকে।

শুভা বলে উঠল, আহা, আমার জন্যে নয়। সে তুমি কত দেবে আমি জানি।

আমি বলছি, ক্রমির বিষের জন্যে।

এতদিন পরে সেই কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে।

তখন কি সব আইনটাইন হয়েছে। সোনার দোকানে বাইশ ক্যারেটের গয়না গড়ানোই যায় না। গেলেও লুকিয়ে চুরিয়ে।

হিরণ্ময় হতাশ ভাবে বলেছিল, সংসারই চলে না, গয়না গড়িয়ে রাখবে। শুভা বলেছে, আহা, চেষ্টা করেই দেখ না। মাসে মাসে কিছু বাঁচিয়ে, মাঝে মাঝে যদি করি এখন থেকে, বিয়ের সময় ভাবতে হবে না।

একটু ধৈর্য বলেছে, বিয়ে তো আর উঠে যাবে না, গয়নাটয়নাও দিতে হবে। যারা আইন করে তারা তো মানুষের কথা ভাবে না, বড় বড় মুখে শুধু দেশের কথা বলে। যেন মানুষকে বাদ দিয়ে দেশ।

হিরণ্ময়ের মনে হয়েছে কথাগুলো মিথ্যে নয়। আমি আছি বলেই, আমার সংসার। সংসার আছে বলেই সমাজ। সমাজ আছে বলেই দেশ। আইন সকলের কথা ভাবতে গিয়ে কারো কথাই ভাবে না।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ছে, ওদের সেই আগের বাড়ির গলিতে একটা ছোট্ট অঙ্কার কুঠিরিতে একজন স্যাকরা বসত। দিনরাত একটা তোলা উনোনে অ্যালুমিনিয়ামের বাটি বসানো। তাতে নীল নীল, কখনো হলুদ হলুদ, অবিরত জ্বলছে। অত ভাল করে দেখেনি কোনদিন। অবিনাশ নাম বোধহয়।

পাড়ার সবাই ওর কাছে গয়না গড়াত। বাইশ ক্যারেটের করে দিত। রুমির বিয়ের জন্যে সেই চার বছর বয়েস থেকে একটু একটু করে গয়না গড়িয়ে এসেছে শুভা, ঐ অবিনাশ স্যাকরার কাছেই।

অভাব অনটন তো ছিলই। তবু সংসারের খরচ কমিয়ে বছরের পর বছর রুমির বিয়ের জন্যে তৈরি হয়েছে। মনে হয় যা করাতে পেরেছে তাতেই চলে যাবে।

তবে শুভা একদিন বলেছিল, প্যাটার্নগুলো সব পুরোনো, বিয়ের সময় নতুন করে গড়াতে হবে।

হিরণ্ময় চমকে উঠেছে, সে তো অনেক খরচ।

হেসেছে শুভা। —যখন করিয়েছো তখন তো সোনার দামই ছিল না। এখন হ'লে আর পারতে। এই একটা উপকার রুমির সেই কেজি স্কুলের বন্ধুর মা করেছিল, ভাগ্যিস শিখিয়েছিল। হাসতে হাসতে বলেছে, তার নামটাও ভুলে গেছি।

রুমির জন্যে সেই চার বছর বয়েস থেকে কত চিন্তা।

—তুমি কিছু ভেবো না, ও তো আমার মেয়ের মত। আমার মেয়ের মতই থাকবে।

লেংচে লেংচে এসে দাঁড়ানো অঙ্কম বাপটাকে শুভা বলেছিল।

এখন সেই কথাটা ঠাট্টার মত লাগছে। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ঝুঁকিটুকুও নিতে চায়নি হিরণ্ময়।

পাড়ায় একটা কাজের মেয়ে ওর বন্ধু। তার সঙ্গেই দিদির খোঁজে গিয়েছিল। রাস্তাঘাট তো চেনে না, সেজনেই শুভা বলেছিল তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কসবায় না কোথায় যেন। ঠিকানাটা লেখা ছিল শুভার কাছে।

শুভা বলে দিয়েছিল, মেয়েটাকে যেন কিছু বলিস না।

দিদি গঙ্গার সঙ্গে দেখা হয়নি। যে বাড়িতে কাজ করে দিদি, সে বাড়ির গিন্নিমা বলেছেন, সে তো ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। ফিরে এসে বলেছে যমুনা। আর শুভা জিগ্যেস করেছে, তোর বন্ধুকে কিছু বলিসনি তো?

মাথা নেড়ে যমুনা জানিয়েছে, না।

ওর সারা মুখ তখন বিভ্রান্ত, চোখে কান্না।

হিরণ্ময় আর শুভা বিশ্বাস করেছিল ওর কথা। এখন বুঝতে পারছে, সবই বলেছে ও মেয়েটাকে। বলাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে নিশ্চয় গোপন রাখবে। না রাখলেও তেমন ভয় নেই। বীরেশ্বরবাবু তো জেনে গেছেন। মেয়েটাকেও নিশ্চয় লছমনের নাম বলেছে।

লছমনের নাম বলার পরই তো অনেকখানি স্বস্তি।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার দায়িত্বটা যমুনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেই অনেকখানি নিশ্চিন্ত লাগছিল হিরণ্ময়ের। যা টাকা লাগে দিয়ে দেবে। যমুনার হাতে তো কিছু টাকা দিয়েও দিয়েছে শুভা।

বেশ হাঙ্কা লাগছিল। ভেবেছিল ছুটির পর বিকাশের কাছে চলে যাবে। অনেকদিন পরে প্রাণ খুলে আড্ডা দিতে ইচ্ছে করছিল।

কিন্তু আপিস থেকে বেরিয়ে বিকাশের কাছে যেতে ইচ্ছে হল না। আবার যেন দু'ভাবনাটা চেপে বসল। কিছুতেই নিঃসংশয় হতে পারছে না। যমুনা কি ওর সেই বন্ধুটাকে নিয়ে যেতে পেরেছে? ঝুঁজে পেয়েছে ক্লিনিকটা? ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছে? কি বললেন তিনি? হাজারো প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। আর তার উত্তর জানার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠল হিরণ্ময়।

বিকাশের কাছে যাওয়া হল না।

বাড়ি ফিরে এসেই প্রথম প্রশ্ন, গিয়েছিল?

শুভার মুখ আবার ধমধমে।

বিরত বোধ করল হিরণ্ময়। উদ্ভীষ কণ্ঠে জিগ্যেস করল, কি হল? দেখা

পেয়েছে ?

শুভা কোনরকমে বলল, হঁ। কিন্তু...

বলেই থেমে গেল।

—কি বলছে বলবে তো ?

শুভা ধীরে ধীরে বললে, তোমাকেও যেতে বলছে। যমুনা বললে, ডাক্তারবাবু বলেছেন বাবুকেও সঙ্গে নিয়ে আসবি। তোমাকেও নাকি দরকার।

বিরত বোধ করল হিরণ্ময়। তুর কুচকে উঠল ওর। বললে, সে কি ! আমাকে আসার কেন ? আমি এ-সবের মধ্যে যাব কেন।

যমুনার ওপর প্রচণ্ড রেগে গেল হিরণ্ময়। ওকে এর মধ্যে টানা কেন। যমুনাকে এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠানো হল, কাল্লাকাটি করে ও তো ডাক্তারকে রাজি করাতে পারত। জিগ্যেস করতে পারত, কত টাকা লাগবে।

ক্লিনিকটা বোধহয় সরকারী। টাকাই লাগবে না। লাগলেও যৎসামান্য। ও তো বলতে পারত, বাবুকে এর মধ্যে আনবেন না। কিংবা, কত টাকা লাগবে বলুন, আমিই দিয়ে দেব।

শুভা বললে, আমি তো জিগ্যেস করলাম। ও বললে, ডাক্তারবাবু নাকি বলেছেন কি সব সই করতে হবে তোমাকে।

সই করতে হবে। বুকের ভেতরটা দূরদূর করে উঠল।

বললে, কি সই করতে হবে ?

বুকের মধ্যে একটা চাপা আতঙ্ক। বেশ হাল্কা লাগছিল যমুনার ঘাড় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে। এখন মনে হচ্ছে, যেন আরো গভীরে জড়িয়ে পড়েছে।

—সে তো মারা গেছে। হাসপাতালের সেই নার্স বলছে, বলেই হৃদযন্ত্রের মুখের দিকে অবাক হয়ে জাকিয়েছে।

—জানিস হিরণ্ময়, নার্সটা এমন ভাবে তাকাল আমার দিকে, তাকিয়ে রইল কটমট করে, যেন আমিই দায়ী। তার চোখে রাগ আর সন্দেহ।

মৃত্যুও হতে পারে। মৃত্যুও হয়। ভয়ে গলা শুকিয়ে এল হিরণ্ময়ের। হঠাৎ কি মনে পড়তে শুভা বললে, দাঁড়াও, ওকে কি যেন লিখে দিয়েছে।

নিয়ে আসছি।

একটু পরেই ফিরে এল শুভা। কাগজটা এগিয়ে দিল।

হিরণ্ময় হাতে নিয়ে পড়ল। পড়েই চটে গেল যমুনার ওপর।

বিরতভাবে বলল, মেয়েটাকে নিয়ে কি করি বলো তো ! গল্যর স্বরে একটা কান্নার রোল ফুটে উঠল। —একটা সামান্য মিথ্যে কথাও বলতে পারলি না।

শুভা বললে, ওকে তো তুমি শিখিয়ে দাওনি।

শুভার ওপরেও যেন চটে গেল হিরণ্ময়। —নিজের সর্বনাশ করার সময় তো কাউকে শিখিয়ে দিতে হয়নি।

স্বগতভাবে বললে, কি করি এখন।

শুভা বোধহয় কাগজের লেখাটা পড়েও দেখেনি।

হিরণ্ময় হতাশায় ভেঙে পড়া গলায় বললে, আমারও সর্বনাশ না করে ও ছাড়বে না।

—কেন, কেন, কি লিখেছে ? উদ্ভীষ হয়ে জিগ্যেস করল শুভা।

আর হিরণ্ময় ধীরে ধীরে বললে, বয়েসটাও একটু বাড়িয়ে বলতে পারেনি। তা হ'লেও হয়তো এত সব লাগত না।

একটু থেমে বললে, ও তো অ্যাডাল্ট নয়, সেজন্যে কনসেন্ট চাই। সই করে দিয়ে আসতে হবে।

হিরণ্ময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চূপ করে রইল।

তারপর হঠাৎ বললে, না না, সইটাই আমি করতে পারব না। অসম্ভব। ওকে বলো, ও নিজে গিয়ে যদি ব্যবস্থা করতে পারে করুক। তা না হ'লে...

অসহ্য একটা যন্ত্রণা বুকে চেপে বললে, তাড়িয়ে দাও, ওকে তাড়িয়েই দাও। ও যা খুশি করুক, আমি এর মধ্যে নেই।

শুভাও আশ্চর্য হয়ে গেছে। —বাঃ রে, আমরা কেন সই করতে যাব ! ওর বাবা তো তখন আমাদেরই দায়ী করবে। ঐ কনকনে দিদিটা...

সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা আতঙ্ক ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে সামনে দাঁড়াল।

হিরণ্ময় ফিসফিস করে বললে, মরারও তো যেতে পারে। তখন...

কি ভীষণ একটা দৃশ্য। কোনদিকে যাবে ও। একটা দিন প্রতি মুহূর্তে একটা ভয় নিয়ে কেটেছে। ওর বাবা-মা না এসে হাজির হয়। কিংবা ওর সেই চালাকচতুর দিদিটা। গঙ্গা। কি বলবে তখন ? ওরা তো বলবে, আপনাদের ওপর ভরসা করে রেখে দিয়েছিলাম। দায়িত্ব তো আপনাদেরই।

পাক্কার লোক জানবে। হেঁহে চিংকার।

হিরণ্ময় ভাবতেও পারছে না। আত্মসম্মান। মধ্যবিত্ত মানুষের এটুকুই তো সম্পদ। তাও যদি চলে যায়। পাড়ায় মুখ দেখাতে পারবে না।

বাড়িওয়ালা বীরেশ্বরবাবু তো দিবি বিহঙ্গী চাকরটাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে এখন কাড়া হাত-পা। বলবেন, আমি কি জানি। সে তো দেশে চলে গিয়েছে। হয়তো বলবেন, যমুনাই যে সত্যি কথা বলছে তার ঠিক কি। ওরা সব

পারে।

অসহ্য এক দৌটানার মধ্যে হিরণ্ময় তখন ছিন্নভিন্ন হচ্ছে।

বীরেশ্বরবাবুর কথাগুলো মনের মধ্যে ছালা ধরিয়ে দিচ্ছে। হয়তো ওর বাবা-মাকেও বলে বসবেন, ঐ বয়েসের একটা মেরেকে দোকান-বাজারে পাঠাত কেন। টিউবওয়েল থেকে জল নিতে পাঠাত সন্ধ্যার পর।

কথাগুলো মনে পড়তেই হিরণ্ময়ের মনে হ'ল, আমিই দায়ী। আমারই দায়ী। কিন্তু এই অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। উপায় নেই।

পরের দিন সকালে আপিস যাবার আগে হিরণ্ময় বললে, শোনা, ওসব মায়াদম্বা করে লাভ নেই। কিন্তু আর ক্রমি বেরিয়ে গেলে দুপুরবেলা তুমি শুকে তাড়িয়েই দাও। যেমন করে পারো তাড়াও।

একটু থেমে বললে, দু'তিনশো টাকা বেশি দিয়ে দিয়ে। দু'তিনশো টাকা। যেন ঐ টাকাটা দিয়ে অপরাধবোধ থেকে বাঁচতে চাইছে হিরণ্ময়।

ঘোর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরল হিরণ্ময়। বৃকের মধ্যে উৎকণ্ঠা। আর ভয়। দরজার বেলটা বাজাতে গিয়েও হাত কঁপে গেল।

পায়ের শব্দে বুঝতে পারল শুভা ছুটে আসছে। দরজায় বেল-এর সুইচ টিপলেই শুভা বুঝতে পারে। প্রত্যেকটা বেল-এর আওয়াজ ওর চেনা হয়ে গেছে। ঐ কিন্তু এল ! যমুনা, ক্রমি এসেছে দরজা খুলে দে। কিংবা, দ্যাখ, বাবু এসেছে।

হিরণ্ময় চেনে শুধু শুভার পায়ের শব্দ।

শুভা একটু বেশি শব্দ করে যেন দরজাটা খুলে দিল।

হিরণ্ময় শুভার মুখে হাসি দেখতে পেল। এ-রকম হাসি ও শুভার মুখে অনেককাল দেখেনি। সারা মুখে যেন আনন্দ উপছে পড়ছে।

হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে বললে, গেছে।

—চলে গেছে ? হিরণ্ময়ের মুখেও হাসি ফুটল।

যেন এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কিছু নেই। আর কিছু হতে পারবে না। হিরণ্ময়ের মনে হ'ল, আঃ কি আরাম। মুক্তি, মুক্তি। একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছে। একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয় থেকে।

খুশি উপছে পড়ছে তখন হিরণ্ময়ের মুখেও।

নিজের ঘরটিতে এসে ঢুকল।

আর হাসি হাসি মুখে শুভা বললে, কি করে যে তাড়িয়েছি তুমি ভাবতে

পারবে না। যেতে কি চায় !

হাসতে হাসতে বললে, মেয়েটা বড়ো বোকা, বোকা আর সরল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শুভা বলল, ও যদি না যেতে চাইত, কি করতাম বলো। কিছুই তো করার ছিল না।

হিরণ্ময় বললে, যাক, বাঁচা গেছে।

বৃকের ওপর চেপে বসে থাকে ভারি পাথরটা সরে গেছে। সর্বস্ত শরীর-মন ছাঁকা হয়ে গেছে হিরণ্ময়ের। জীবনে এমন আনন্দ যেন কখনো পায়নি।

হিরণ্ময় আপিসের পোশাক ছাড়ছিল। শুভা পাখাটা ফুল স্পীডে চালিয়ে দিল। তারপর হাসি হাসি মুখে হেলানো চেয়ারটায় গিয়ে বসল।

যেন নিজেই নিজের বুদ্ধির তারিফ করছে এমনভাবে গদগদ হয়ে বললে, স্রেফ বলে দিলাম, ডাক্তারের কাছে আমরা কেউ যেতে পারব না। ... ধমক দিয়ে বললাম, এখানে এত কান্নাকাটি করতে পারছিস, আর ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে বলতে পারলি না।

শুভা আবার বললে, ধন্য মেয়ে, উত্তর দিল না, চুপ করে রইল।

হিরণ্ময় যেন একটা গল্প শুনছে, আর কোন উত্তর নেই, দৃষ্টিভঙ্গি নেই। পোশাক বদলে এসে খাটের এক প্রান্তে বসল, হেলানো চেয়ারটির দিকে তাকাল, শুভার মুখের দিকে। যেন কাহিনী শেষ হয়ে গেছে, এখন শুধু উপসংহারটুকু। এখন উৎকণ্ঠা নেই, শুধু কৌতূহল।

শুভা বললে, খুব কড়া হয়ে বললাম, তুই যা করেছিস তারপর যে এ কদিন রেখেছি তোকে সেই তোর ভাগ্য।

হঠাৎ বলে উঠল, মেয়েটা খুব বিশ্বাসী ছিল কিছু। ওকে তো অত টাকা দিয়েছিলাম, শুধু বাস ভাড়া খরচ করেছে, বাকি টাকা এসেই ফেরত দিল।

হিরণ্ময় জিগ্যোস করল, চলে যেতে বললে, আর চলে গেল ?

শুভা হেসে উঠল। —তাই কখনো যায় !

—তবে !

শুভা ধীরে ধীরে বললে, চুপচাপ ওখানটায় বসে ছিল ধম মেয়ে। একটা কথাও বলছিল না। আমি টাকা এনে ওকে বাকি মাইনে বুঝিয়ে দিলাম। ও বোকার মত আমার মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

হিরণ্ময় খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে ছিল, সোজা হয়ে বসল। — দিল ?

শুভা হাসল। বললে, নিতে কি চায়, হাতই বাড়ায় না। শেষে নোটগুলো জুড়ে দিলাম ওয় হাতে। নিচ্ছিল না, আবার দিতেই কেমন কামড়ে ধরল যেন।

কিছুদিন ভেতরে ভেতরে অনুশোচনার বন্ধ হইল। কিংবা অপরাধবোধে ?

ও ইটাই প্রশ্ন করল, বাস, কিছু দিলে না ?

শুভা বলে উঠল, বাঃ রে, তা কেন ! কবে বেশিই নিয়েছি। তার চারটে একশো টাকার নোট। তুমি তো দু'তিনশো বলেছিলে।

— নিল ?

শুভা আবার হাসল। বললে, আসলে কি জানো, মেয়েটা কেমন যেন ভাষালা মত হয়ে গিয়েছিল। নোটগুলো ওর হাতে উজ্জ্বল দিলাম, কেমন হাতের-মুঠোর কামড়ে ধরল।

একটু খেমে বললে, ওর জামা-কাপড় খসিটার সব চুকিয়ে নিয়ে বললাম, নে, যা।

শুভা তখন হাসছে। কিছু হাসিটা খুব জাভাসিক মনে হচ্ছিল না।

ও অবাক হয়ে বললে, চলে গেল ?

শুভা তাকাল হিরন্ময়ের দিকে। — এত সোজা। তুমি তো বলে নিয়েই খালাস, তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও। বমি ধাক্কাতে তা হ'লে বুকতে।

হিরন্ময় একটু লম্বা গেল। শুধু শুভার কাছে গুনেই যে ছবিটা ফুটে উঠছে সেটাই তো অসহ্য। বুকের ভেতর টমচক দিচ্ছে মেয়েটার মুখে, একটা চপা ভরপুর। এই নিশ্চিত হওয়ার পরেও।

শুভা আর হাসল না। বললে, ও তো কিছু বুকতেই পারছিল না। আমি যে ওকে একেবারে চলে যেতে বলছি, কানেই ঢোকেনি।

একটু থামল শুভা। তারপর হাসতে গেল কি ফেন বলাই জন্যে। ওর গলার বঁক জড়িয়ে গেল, হিরন্ময় দেখল শুভার চোখ ঠেলে ঝল এসে গেছে।

ওর নিজেরও ভীষণ খামাখা লাগছিল।

চপা কাগজ শুভার গলার বঁক গাঢ় হয়ে এল। — কিছুতেই ওঠে না, শেষে আমি যেই রেগে গিয়ে...

কথা বলতে পারছিল না শুভা। অঁচলে চোখ মুছল। একটু বোধহয় নিজেতে সামলে নেবার চেষ্টা করল। তারপর বললে, আমি যেই রেগে গিয়ে ওর হাত ধরে টেনে ফুললাম, ডুকরে ডেকে উঠে এমন জোরে রাজাবয়ের জামালায় গরামটা ধরে রইল...

হিরন্ময় বলে উঠল, বলাই নু, বলাই না। অসহ্য।

ফেন ছবিটা যাতে দৈর্ঘ্যে না হয় সেজন্যেই হিরন্ময় চোখ বুজে ফেলল।

আর শুভা বেশ কোঁড়ের মতো বসিলে, তবেই বোঝে, একটা জামাকেই

ধরে নিয়েছে। তুমি তো দিবি বলে নিয়ে চলে গেলে।

একটু খেমে বললে, এখন বুকল কিছুতেই ছাড়ব না, হঠাৎ কি মনে হল ওর, ধরাও ছেড়ে দিল। বলোটা নিয়ে কান্ডে কান্ডে আমাকে পা দুটো ধান্য করবে কেন।

হিরন্ময় হাসি শুভার মুখে। — আমি তো বুকতে পারিনি, পা দুটো নিয়ে ছবিটার কান্ডে ভেবে পা সরিয়ে নিয়েছি। ও এগিয়ে এসে পা দুটো ধান্য করল। দাঁড়া মুখ তখন ওর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। কান্ডে কান্ডে বেরিয়ে গেল। আমি দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দৈর্ঘ্যলাম। পেটের পানি হয়ে যেতে তবে শান্তি।

বলে হেসে উঠল শুভা। ওটা হাসি না করা বোঝা গেল না।

হিরন্ময় কেমন বিভ্রান্ত ভাবে বলল, চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ, কালো মুখেই যেন কোন কথা নেই। কেউ কোথাও কিছু পাল্লে না। কিংবা দু'জনেই বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছে, একটা বিপর্যয় থেকে। এখন মেয়েটার জন্যে দুঃখ-ভয় ধরি।

কিন্তু কেউই যেন অপরাধবোধ সরিয়ে ফেলতে পারছে না।

শুভা ঝগজগতির মত বললে, আমি ঐ ডাক্তারের কাছেই ওকে যেতে বলেছি বারবার। যাযে কিনা কে জানে, ওর কানে তো কোন কথাই ঢুকছিল না।

একটু খেমে বললে, হিরন্ময় যে-সব হাউসকোট ম্যাগসি শাড়ি নিয়েছিলেন, যাবে কেন চাইছিল, আমি কিছু কিরিয়ে নিইনি।

হিরন্ময় মনে মনে হাসল। কিছু বলতে পারল না। আমি কিছু কিরিয়ে নিইনি।

হিরন্ময় সত্যি কি তাই। জামরা বমি কিরিয়েই নিয়েছি, হিরন্ময় মনে মনে হাসল। আত্মসম্মান। একটা ভুলো কথা, একটা ভুলো জিনিস। আমাদের জে...

হিরন্ময় হাসল। অহত্বার নয়, আগে ভেবেছিল অহত্বারেরই আরেক দায়।

হিরন্ময় শুধু শুধু, পাড়াপড়শীকে, আইনকে, দুর্ভাগকে।

হিরন্ময় তাকাল, আসলে আমরা কিছুই ওকে কিরিয়ে নিইনি। ভান্না বেঁচে...

হিরন্ময় হাসল ওর ঝোঁটা কাপকে। 'মেয়ের মতই রাখবেন মা', ওর মা বলেছিল...

হিরন্ময় হাসল হাত বুলিয়ে। ওর সেই কনকর্নে যিনি বললে, চাক পাঁচটা টি মা,...

ঝোঁড়া বাগটা হেসে বলেছিল, আসা-যাওয়া কত খরচ যা, টেনের ভাড়া তো বাড়তে-বাড়তে লসি তুলসেও ছোঁয়া যায় না।

[illegible]

মৃত নেমে পড়েছিল হিরণ্ময়।

ভারপর দৌড়তে দৌড়তে আগের স্টেপে কিলে এসেছিল।

পাপরক্ষের মত ও ভিড়ের মধ্যে ঝুঁজছিল, ঝুঁজছিল। একটা মুখ। বাসের জানালা থেকে দেখে মনে হল সেই মুখ। গ্রাম্য আর সরল, বড় বড় চোখ, কান্নার কুটি তার চোখে। পলিমাটির মত গায়ে রক্ত, পলিমাটি দিয়ে গড়া একটা নিশাপাল মূর্তি।

হী, নিশাপাল। হিরণ্ময় জানে শরীর বড়ো অবিশ্বাসী।

সেই ছবিটা মনে পড়ে গিয়েছিল। এই রকম বয়েসেরই একটা মেয়ে। তাই মারা গেছে আগের মতো, তখনও হাসপাতাল থেকে ডেডবডি এসে পৌঁছানি।

শোকগ্রস্ত বিহ্বল মা, তার সামনেও কে এক কাপ চা রেখে গেল। আর শূন্যবাক সেই মা চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল। শরীর বোঝায় শোকের চেয়েও বড়।

তার চেয়েও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল হিরণ্ময় সেই মেয়েটিকে দেখে।

সারা বাড়ি নিশূপ, শোকসন্তপ্ত আত্মীয়পরিজন। আর মেয়েটির চোখে রক্তিন শ্রোম, ছোলেটির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। চোখে মুগ্ধতা। কে বিশ্বাস করবে হাসপাতাল থেকে এখনও ভাইয়ের ডেডবডি এসে পৌঁছানি।

যমুনা, তুই কোন দোষ করিসনি, কোন দোষ করিসনি। শরীর বড়ো অবিশ্বাসী রে।

হিরণ্ময় তর তর করে ঝুঁজল ভিড়ের মধ্যে, সেই মুখ, যমুনার মুখ।

আহা, যদি পাওয়া যায়।

নিজের কাছে চিরকালের জন্যে ছোট হয়ে থাকতে পারবে না হিরণ্ময়। মিথ্যা দুর্নাম, বিশেষ অপবাদের ভয়টাও মিথ্যা। আত্মসন্ধান? একটা ভুতো শব্দ, অর্থহীন। আরেকজনের জীবনের চেয়ে বড় নয়।

আত্মসন্ধানিতে চোখে জল এসে গেল হিরণ্ময়ের। তুচ্ছ একটা আত্মসন্ধানি বাঁচাতে গিয়ে একটা সুন্দর জীবনকে ও ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে।

—দুই মেয়ে আমার। ওর বাবা বলছে, একটা ডান হাত, একটা বাঁ হাত।

ভিড়ের মধ্যে যমুনাকে ছোঁটাছুটি করে খুঁজে বেড়াল হিরণ্ময়। বাসের জানালা থেকে সেসে মনে হয়েছিল কোন্ যমুনাই।

কেল না। না, কোথাও নেই। হঠাৎ জ্বল দেখেছে। অন্য কেউ।

হিরণ্ময়ের মনে হ'ল একবার যদি দেখতে পাই, সব বিস্ময় তুচ্ছ করে, সব দুর্নামের ভয় তুচ্ছ করে বলবে, চল যমুনা, অসি-সই করে দেব। জেঁকে খাঁচা।

আমরাই তো দায়ী, আমরাই দায়ী।

করিনি। যেখানেই চোখ যায়, ও ভিড়ের মধ্যে, কান্নার ধারে, সর্বত্র একটা মুখই চোখে। যমুনার মুখ।

কতকো সেকথাটা ও বলতে পারল না। ব্যথা পাবে, দুঃখ পাবে। হিরণ্ময় কতকো নিজের দুঃখ আরো বেশি। শুভাও নিশ্চয় জেতরে জেতরে দখল হ'ল। নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে গেছে।

কেল বেজে উঠল, দরজার বেল।

শুভা বলে উঠল, দেখো তো কে। বোধহয় কাগজওয়ালা।

হিরণ্ময় উঠে গেল, গিয়ে দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মত আতঙ্কে নিউয়ে উঠল হিরণ্ময়। সেই কনকনে চালকচতুর কালো মেয়েটা। কি তীর দেহ। যমুনার মিলি। গলা।

সব যেন ভালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে হিরণ্ময়ের। কি বলবে?

মেয়েটা হেসে উঠে বলল, যমুনাকে একটু ডেকে দিন।

কয়, হিরণ্ময় তো খুব ভাল অভিনয় জানে।

—যমুনা? সে তো চলে গেছে।

—চলে গেছে? ভুল ইচ্চকে উঠল মেয়েটার। —কোথায়?

—জা তো জ্বলি না। হিরণ্ময় বলল।

শুভাও হঠাৎ শুনতে পেরেছে। ও এগিয়ে এল।

কাল, যমুনা ভে কবেই চলে গেছে, মাইনেপত্তর মিটিয়ে নিয়ে।

মেয়েটা জবাব চোখে তাকালে।—

কাল কাল, সে তো কিছুতেই থাকতে চাইল না, আমরা কি বেধে রাখবো।

কাল কাল, তাকে তো আমরা পাঠিয়েছিলাম তোমাকে ডেকে আনতে।

কাল না, দেশে গিয়েছিলে।

কাল নেড়ে বললে, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

কাল কাল, মনেই বললে, কোথায় যে গেল।

কাল কাল, আমরা তো ভেবেছিলাম তোমার কাছেই গেছে।

কাল কাল, আবার বললে, কোথায় যে গেল।

কাল কাল, মুখে কিছুকল দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল সে। তুচ্ছ। কাল কাল, কাল কাল কখনো দেখিনি ওরা।

হিরণ্ময় দরজাটা বন্ধ করে দিল। নিশাপাল।

সঙ্গে সঙ্গে শুভাও বলে উঠল, কোথায় যে গেল।

কেন হিরন্ময়কেও ভয়ের কথা। এখন আর কোন ভয় নেই, আল্লাহ নেই।
এখন শুধু অনুশোচনা। এখন তাঁর অপরাধবোধ যেন হিরন্ময়কে কুরে কুরে
খাচ্ছে। ভয়ানকও।

একদিনের অন্তিমক্ষণে বড় মা আরেকজনের জীবন। হিরন্ময় মৃত্যু মৃত্যু
কলসে, তাকে আত্মসম্মান বলে না, ওটা একটা নিষ্কর অস্ত্রের। কোন মিথ্যা
ভয়, মিথ্যা অপরাধ যেন আমাকে স্পর্শও না করে। এখন মনে হচ্ছে নিজেকে
বীচারা নিয়ে একটা জীবন মট হয়ে গেল।

জানি, হিরন্ময় এ অপরাধবোধটা ওসের কুরে কুরে যায়। যখনই মনে পড়ে।
মিথ্যা থাকে তো? কোন হাতুড়ে জবাবের কাছে গিয়ে শৌছিনি তো? এক
এক সময় বুকের ভেতরটা মোড়ক দিয়ে বাত্রে, চোখ চেলে কলি আসতে চায়।
হিরন্ময় জরুরে সামান্য জীবন একটা এক ওসের ডাঙা করে বেড়াবে, ডাঙা করে
বেড়াবে। কোথায় যে গেল।

চোখের সামনে যেন দেখতে পায় হিরন্ময়, আমাকলঙ্কের শূন্যতা নিজের
অবস্থার বগলে নিয়ে কান্ডিতে কান্ডিতে কলুস গিলি বেয়ে মেয়ে খাচ্ছে, মেয়ে
খাচ্ছে।

কে সেমে গেল? হিরন্ময়ের বুকের ভেতরটা বলে উঠল, আমরাই।

